পৈতৃক সম্পত্তি

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,

প্রণীত ।

৭৮।১ হারিসন রোড কলিকাতা ।
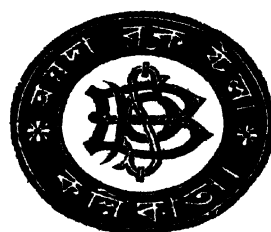
(রাজসংস্করণ)—মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য।
অন্নদা বুক-ষ্টল,
৭৮।১ নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থকার প্রণীত
অন্নদা বুক ষ্টলের ॥০ সংস্করণের নবম গ্রন্থ
শুকতারা
(ছোট গল্পের বই)
প্রকাশিত হইয়াছে।
মূল্য ॥০ আনা।
অন্নদা বুকষ্টলে ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।

নিউ সরস্বতী প্রেস,
১৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

"পৈতৃক সম্পত্তি" একখানি ইংরাজী উপন্যাসের প্লটের ছায়াবলম্বনে রচিত। পরম শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় সাহিত্যানুরাগী ৺অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, ডাক্তার মহোদয় ইংরাজী উপন্যাসখানির ভাব লইয়া বাঙ্গালায় একখানি উপন্যাস লিখিতে আমাকে পরামর্শ দেন। তদনুযায়ীই এই পুস্তকখানি লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হই। আজ তিনি জীবিত থাকিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত দেখিলে না জানি কতই প্রীত হইতেন! তাঁহার পরামর্শ যে অধীন লেখক কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমাদের এখন একমাত্র সান্ত্বনা। এই কথা বলিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র ভূমিকার অবতারণা। লেখকের অক্ষমতা জ্ঞানে পুস্তকখানির সকল ত্রুটি সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা,
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

(১)

জ্যোতির্ম্ময় বাবু শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে ডাক্তারকে কহিলেন,—"আপনি কিছু লুকাবেন না, সব কথা খুলে বলুন।" ডাক্তার তাঁহার কঠিন রোগজীর্ণ মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়া সত্য কথাই বলিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া ধীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

"আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আসছে, কিন্তু এত খারাপ হয়ে গেছে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। মৃত্যু যে এত সন্নিকট তা জানতাম না।"

এই কথা বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাঁহার ছড়ি লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে হরনাথ বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি জীবনে অনেক সুখ ভোগ করেছি; পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ক্রমেই হীন অবস্থা হ'তে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছি। অনেকে মনে করেন, আমি সুখভোগের অপেক্ষা পরিশ্রম করেই জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়েছি; কিন্তু সে কথা সত্য নয়।

কাজের মধ্যে আমি কি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করি, তাঁরা তা কিছুই অনুভব করতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার আমার কোনও কারণই নেই। তাহলে আমি এখন আসি।"

হরনাথ বাবু জানালার নিকট গিয়া সেই সুগঠিত সরল মূর্ত্তির দিকে একবার তাকাইলেন। মূর্ত্তিটী রাস্তার উপর দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন তিনি ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিলেন,---"বৃদ্ধ শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এতটুকুও ভীত হয় নি!"

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর গাড়ী রাস্তার মোড়েই দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু তিনি গাড়োয়ানকে গাড়ী লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া নিজে হাঁটিয়াই বাড়ী চলিলেন। ধীরপদবিক্ষেপে সমতল ভূমির উপর দিয়া গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাস্তার অনেক লোক সসম্মানে অভিবাদন করিল।

মির্জ্জাপুর নগরের উপকণ্ঠেই তাঁহার সুন্দর প্রস্তরময় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা অবস্থিত। জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাঁহার বাসস্থানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া কারবারের কুঠি ও আড়তের দিকে অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকাইয়া রহিলেন। সেই কুঠির ভিতরেই তাঁহার অসীম ধনরত্ন সঞ্চিত; সুতরাং তাঁহার অন্তঃকরণও সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে।

তিনি শৈশবে সামান্য কর্ম্মচারিরূপে ঐ কারবারের কাজে ঢুকিয়াছিলেন; সেইখান হইতেই তিনি এই অগাধ ধনরত্ন অর্জ্জন করিয়াছেন এবং স্থানীয় রায়বংশের বিষয়-সম্পত্তি সব ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। বাল্যকালে এই বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তিনি কতবার লুব্ধনয়নে তাকাইয়া-

ছিলেন ; কিন্তু একদিন যে তিনিই উহার মালিক হইবেন, তাহা তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

আজ তাঁহার জীবন-নদীতে ভাটা পড়িয়াছে। দ্রুত হস্ত-সঞ্চালনের দ্বারা কারবারের নিকট যেন বিদায় লইয়া তিনি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাস-ভবনের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং বিস্তৃত হলঘরের ভিতর দিয়া তাহার প্রান্তভাগে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপনীত হইলেন।

কক্ষটি যে কেবলমাত্র ছোট তাহা নহে, তাহার আস্‌বাবও খুব সাদাসিধে। একটি সাধারণ টেবিল, একখানি কাঠের চেয়ার ও একখানি অতি অল্পমূল্যের আরাম-কেদারা। ঘরের কোণে এক প্রকাণ্ড সিন্দুক। ঘরটি দেখিতে সামান্য আফিস ঘরেরই মতন ; কোনও ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বৈঠকখানা বলিয়া মনে হয় না। শিকারের বন্দুক, মাছ ধরিবার ছিপ্ প্রভৃতি কোনও সখের জিনিষ ঘরের মধ্যে ছিল না। কোনপ্রকার ক্রীড়ার প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন না। সকল প্রকার ক্রীড়াকেই তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমশীল ব্যবসায়ী লোকেরা ক্রীড়াকৌতুকে মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে আদৌ সম্মত নহেন। ঘরের দেওয়ালে একখানি ছবি টাঙান ছিল, তাহার সম্মুখভাগ দেওয়ালের দিকেই উল্টানো।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু সেই শক্ত কাঠের চেয়ারের উপর বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘনসন্নিবিষ্ট-লোমযুক্ত ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ও ওষ্ঠদ্বয় দন্তের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল তিনি সম্মুখে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর চেয়ার হইতে উঠিয়া

দেওয়ালের নিকট গিয়া ছবিখানি সোজা করিয়া দিলেন এবং অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছবিখানি একটি বালকের ফটো। বালকটি বেশ সুশ্রী; মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখিতে অনেকটা জ্যোতির্ম্ময় বাবুরই মতন। কিন্তু ইহার দেহের অবয়বের গঠন তাঁহার অপেক্ষা অধিক কোমল ও সুন্দর। বালকের নয়নদ্বয়ে বালসুলভ চপলতা ও নির্ভীকতার মধ্যেও কোমলতা ও মহানুভবতা প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে।

এই ছবিখানি জ্যোতির্ম্ময়বাবুর একমাত্র পুত্রসন্তান অমিয়কুমারের ফটো। পিতা পুত্রকে নিজের প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন এবং তাহার সুন্দর আকৃতি, মনের তেজ ও অসম-সাহসিকতার জন্য মনে মনে বিশেষ গর্ব্বও অনুভব করিতেন। কিন্তু অধীনস্থ অপরাপর ব্যক্তির ন্যায় পুত্রকেও তিনি কঠোর শাসনাধীনে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু অমিয়কুমারও পিতার এই উদ্ধত স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় লাভ করায় আদৌ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে নাই।

পিতাপুত্রের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রায়ই ঝগড়া হইত। তবে ব্যাপার একদিন বিশেষ গুরুতর হওয়ায় পিতা ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুত্রকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। অমিয়কুমার পিতাকে যথার্থই প্রাণের সহিত ভালবাসিত। বিতাড়িত হইয়াও সে প্রথম দরজার নিকট কিছুক্ষণ এই আশায় দাড়াইয়াছিল যে, পিতার রাগ পড়িয়া গেলে, তিনি পুত্রকে পুনর্ব্বার স্নেহভরে ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কঠিন হৃদয় তাহাতেও বিচলিত হয় নাই। তিনি পুত্রের ঔদ্ধত্য কিছুতেই

ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু সেই অবিমৃষ্যকারিতার কথা ভাবিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পুত্রের গৃহত্যাগের পর এই যে প্রথমবার তিনি পুত্রের বিরহে কাতর হইলেন, তাহা নহে। পিতৃস্নেহ যে পাষাণের মধ্যেও প্রবাহিত হয়, তাহা তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অমিয়কুমার সুদূর সিংহলে চা-বাগানে কাজ করিতেছে অনেক অনুসন্ধানের পর এই সংবাদ পাইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য তাহাকে সেইখানে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। সেই সময় হইতেই পুত্রের প্রতিকৃতিখানি দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিয়াছে। তিনি পুত্রকে ক্ষমা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফল-মনোরথ হওয়ায় তাঁহার হৃদয় পুনর্ব্বার পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

মৃত্যু সকল কলহের অবসান করিয়া দেয়। এখন বার্দ্ধক্যে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি তাঁহার পুত্রের সেই কোমল অথচ তেজোদীপ্ত মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

ছবি হইতে শেষে তিনি মুখ ফিরাইলেন। পরে সিন্দুক হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিলেন। এমন সময় ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মারিল।

তিনি তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলি মুড়িয়া খবরের কাগজ ঢাকা দিলেন। তারপর বাহিরে দণ্ডায়মান লোকটির উদ্দেশে বলিলেন,—"ভেতরে এস।"

দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। একজন যুবক ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবকটি লম্বা ও রোগা। তাহার আকৃতি দেখিলে

তাহাকে উচ্চবংশজাত বলিয়াই মনে হয়। তাহার মুখমণ্ডলে প্রখর বুদ্ধির ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। সে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কারবারের কার্য্যাধ্যক্ষ, তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ। অমিয়কুমার অবর্ত্তমানে, সে-ই এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। যুবক ঘরে ঢুকিয়া পিতৃব্যের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল,—"আপনার কাজে ব্যাঘাত হলো, বোধ হয়! কিন্তু জরুরি কাজ, আফিসের পাশ-বইখানি আমার দরকার।"

জ্যোতির্ম্ময় বাবু পাশ-বইখানি হাতে করিয়া বলিলেন,—"না, না, আমার কাজে কিছুই ব্যাঘাত হয় নি। তোমাকেও আমার বিশেষ দরকার ছিল; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এখানে এসে বস।" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রকে বসিবার জন্য চেয়ার দেখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার কৌতূহলপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় বৃদ্ধের শুষ্ক বদনমণ্ডলে নিবিষ্ট করিয়া ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলিলেন,—"হরনাথ বাবু আজ আমাকে কিছু নূতন খবর দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করে বল্লেন, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না।"

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষুর্দ্বয় নত করিল; পরে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কাতরভাবে বলিল,—

"এ্যাঁ, এ্যাঁ, আপনি,—আমার যে আর এ সংসারে আপনার বলবার কেউ নেই!"

"না, না, এর জন্য দুঃখ করো না। তবে যদি তোমার নিজের কথা ধর, সে আলাদা কথা। একদিন না একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে।

আমার কিছুরই অভাব নেই। সকল ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে। অবশ্য আমার বয়স তেমন কিছু বেশী হয় নি বটে, আজ কালকার দিনে আমার চেয়ে বয়সে বড় এখনও অনেক লোক বেঁচে আছে ; কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য দুঃখ করে কোন ফল নেই।”

নরেন্দ্র গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“তবে কি ডাক্তার বাবুর কথা সত্যই ফলবে ? আপনি কলকাতার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন।”

জ্যোতির্ম্ময় বাবু মাথা নাড়িয়া এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইলেন। পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“তার কোন দরকার নেই। আমি জানি, হরনাথ ডাক্তার কখনও ভুল করেন না। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ; কিন্তু আমি তা আদৌ গ্রাহ্য করি নি। কাজের মধ্যেই ডুবেছিলাম। ডাক্তার যা বলেছে, তা ঠিকই ফলবে জানবে। থাক্, ওকথা ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে গোটাকতক কাজের কথা বল্‌তে চাই।”

এমন সময় জ্যোতির্ম্ময় বাবুর চক্ষুর্দ্বয় হঠাৎ ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইল। নরেন্দ্রও লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, ছবিখানি এতদিন উল্টাইয়া রাখা হইয়াছিল, এখন ঠিক সোজা ভাবেই ঝুলিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার মুখের ভাব একটু বিকৃত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই ছবি হইতে সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—“অবশ্য, আমি উইল করে বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করেছি। সত্য কথা ব’লতে গেলে, দু’খানি উইল তৈয়েরী করেছি।” এই বলিয়া তিনি দলিলের উপর হইতে সংবাদ-

পত্রখানি সরাইয়া লইলেন। বলিলেন,—"একখানি উইলে, হাঁ সেই কথাই তোমাকে বলবো, তোমার সে বিষয় জানাও দরকার—আমি সব বিষয় সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে গেছি।—"

নরেন্দ্রের মুখ মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদ্বয় জ্বল্‌জ্বল্ করিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় বাবু কাগজপত্র দেখিতেছিলেন, উহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি যখন মুখ তুলিয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, তখন নরেন্দ্র আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে।

"অমিয় চলে যাবার ও তুমি আসবার কিছুদিন পরেই আমি এই উইল করি। কিন্তু পুত্র-স্নেহ একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া দেখছি অসম্ভব। সে মন্দ ব্যবহার করলেও আমার পুত্র। তুমি জান আমি বাড়ী আসবার জন্য তাকে চিঠি লিখেছিলাম।" তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। নরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিল।—"কিন্তু ফিরে আসার কথা দূরে থাক্, সে আমার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নি।"

"হয় ত পত্র তার হস্তগত হয় নি; কিম্বা পত্রের উত্তরেরও কোন গোলমাল হতে পারে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না, তা কখনই হতে পারে না। সে যে ঠিকানায় ছিল, তার বিশেষ সংবাদ নিয়ে আমি তাকে সেখানে পত্র দিয়েছিলাম।

"আর আজ কালকার দিনে পোষ্ট আফিস হ'তে চিঠি মারা যায় না। থাক্, সে কথা ছেড়ে দাও। আমি তার দোষ ক্ষমা করেছি। হয় ত এ ক্ষেত্রে আমরা দুজনেই সমান দোষী। এ সব বিষয়ে কথা বলে মন খারাপ

করা ভিন্ন আর কোন ফল নেই। যা'হোক্ আমি তাকে একেবারে ত্যাজ্য পুত্র করে যাই নি, তারও একটা ব্যবস্থা ক'রে গেছি।"

তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখিয়া নরেন্দ্রের মনে হইল তিনি বোধ হয় কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"কমল রায়ের বড় মেয়ে মৃণিকাকে তুমি চেন?" নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সায় দিল। কৌতূহল ও উদ্বেগে তাহার মন একতিল স্থির ছিল না। কিন্তু তাহার ব্যবহারে বা মুখের ভাবে সেরূপ কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলিলেন,—"সেই মেয়েটিকে নিয়েই আমাদের মধ্যে ঝগড়া। আমি অমিয়কে বলেছিলাম, তাকে বিবাহ করতে।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

বৃদ্ধ বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইতে লাগিলেন; পরে বলিলেন,—"তার পিতার নিকট আমি নানাপ্রকারে ঋণী। আশৈশব আমরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। তাঁরই পিতার উৎসাহে তোমার ঠাকুরদা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই বিষয় সম্পত্তি সবই তাঁর কাছ থেকেই আমার কেনা। তিনি বিপদে পড়ে আমার নিকট এই সম্পত্তি বাঁধা রেখে টাকা ধার করেছিলেন, পরে তা শোধ দিতে না পেরে এই বিষয় আমাকে বিক্রয় করতে বাধ্য হন। কিন্তু আমি তাঁর কন্যাকে বড়ই স্নেহ করতাম। সেইজন্যই তাকে পুত্রবধূ করে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারিণী করতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু অমিয় আমার সে কথায় সম্মত হয় নি।"

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, অমিয় সে

মেয়েটাকে আদৌ চিনতো না,—সে ক্ষেত্রে তাকে কি রকমে সে বিবাহ করে?"

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

"তাতে কি এসে যায়? সে পরে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারতো। এমন সুন্দরী, বড় ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু অমিয় সব দিক ভাল করে না ভেবে তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলে, তাতে আমার ও যূথিকার দুজনেরই অপমান করা হল। সে কথা ভাবতে ভাবতে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—পুরান কথা সব মনে পড়ে যায়। এ বিষয়ে আর আলোচনা করে কাজ নেই। আমার বিশ্বাস, এতদিনে সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা বেশ বুঝতে পেরেছে।"

নরেন্দ্র তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"তাহ'লে আপনি—"

জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া হাতে এক খণ্ড কাগজ লইয়া বলিলেন,—"এই দেখ উইল, এর দ্বারা আমার বিষয় সম্পত্তি, টাকাকড়ি সবই যূথিকাকে দিয়ে গেছি।"

নরেন্দ্র ক্ষণিক উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। মনের ভাব এইরূপে হঠাৎ প্রকাশিত হওয়ায় রাগে সে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলিতে লাগিলেন,—"এই সর্ত্তে দিয়ে গেছি যে, আমার মৃত্যুর পর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হ'লে অমিয় যদি তাকে বিয়ে করতে অসম্মত হয়, তাহ'লে এই সম্পত্তি যূথিকা যাবজ্জীবন ভোগ

করবে। তার মৃত্যুর পর, সম্পত্তি তোমার অধিকারে আসবে। তবে অমিয় যদি বিবাহের প্রস্তাব করে, আর যূথিকা তাতে সম্মত না হয়, তাহলে এ বিষয় সম্পত্তি অমিয়ই ভোগ করবে।"

দুইজনেই নিস্তব্ধ। পরে নরেন্দ্র গাঢ়স্বরে বলিল,—"এ উইল আপনার টিক্‌বে না।"

জ্যোতির্ম্ময় বাবু হাসিলেন। "তুমি কি মনে কর, আমি একটা যা তা উইল করেছি? তা নয়। আমি অনেক এটর্ণি ব্যারিষ্টারের মত নিয়েছি। উইলের ভাষা এত সরল যে, সামান্য বালকেও তার মর্ম্ম বুঝতে পারবে। এমন কি উকিলেও এর ভেতর কোন দোষ খুঁজে পাবে না। এ উইল আদালতে নামঞ্জুর হবার কোন কারণই নেই। আর সজ্ঞানে আমি এই উইল প্রস্তুত করেছি।"

নরেন্দ্র চেয়ারে হেলান দিয়া তাহার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি ওষ্ঠের উপর বুলাইতে বুলাইতে উইলের বিষয় ভাবিতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এ উদ্দেশ্য সফল হবে। অমিয় নিশ্চয়ই যূথিকাকে বিয়ে ক'রবে। কিন্তু তাহলেও তোমার জন্য কারবার ও কুড়ি হাজার টাকা রেখে গেলাম।"

কারবার ও বিশ হাজার মুদ্রা; বাস্তবিকই প্রচুর ধন-সম্পত্তি বলিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত বিষয় সম্পত্তির তুলনায় ইহা অতি তুচ্ছ ও অল্পমূল্য; অথচ সেই অগাধ সম্পত্তিটাই অপরের হস্তগত হইবে। নরেন্দ্রের পাংশু মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া উঠিল; সে রুক্ষ ভাবে বলিল,—"আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম, যথার্থই অসীম! যৎসামান্য পারিতোষিক ভিন্ন এত অর্থ আমি আশা করি নি।"

জ্যোতির্ম্ময় বাবু হাত নাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ দেখে আমি বড়ই আনন্দিত। আরও দেখ, তোমাকে এই যে কারবার ও মূলধন দিয়ে গেলাম, এই থেকে তুমিও একদিন অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে। আমারও প্রথম বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। আমি সামান্য কর্ম্মচারিরূপে এই কারবারের কাজে ঢুকেছিলাম। তোমার কাছে সে সবই ত পূর্ব্বে বলেছি! আমি যখন ঢুকেছিলাম, তখন কারবারের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। আমি তার ঢের উন্নতি করেছি। এ ব্যবসাও দেশের মধ্যে বড় লাভজনক। তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি এ কাজ আরও ভাল ভাবে চালাতে পারবে। তোমার ভবিষ্যৎ বড়ই উজ্জ্বল!" তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র তাহার নিকট গিয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল,—"আপনার শরীরটা কি খুব খারাপ?"

জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রকৃতিস্থ হইয়া আরাম-কেদারার হাতল ধরিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। "না, না, আমি একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম মাত্র। এক গ্লাস জল চাই। খাবার সময় হয়েছে, চল, এক সঙ্গেই খেতে বসি গে।"

নরেন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হলঘরের তৈলচিত্রগুলির উপর অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নরেন্দ্র তাহার ঘরের জানালার নিকট গিয়া বাহিরে তাকাইল। মখমলের ন্যায় কোমল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ক্রীড়াভূমি, পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত উদ্যান, এই সব সে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এক যুবতী স্ত্রীলোক পাইবে, কিংবা অমিতব্যয়ী অমিয়কুমার তাহাকে বিবাহ করিলে, সে-ই পাইবে। আর নরেন্দ্র, যে প্রতিদিন নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছে যে, সে বৃদ্ধের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাকে নিজের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে হইবে। উইলের পূর্ব্ব সর্ত্তটি কার্য্যে পরিণত হইলে, যূথিকার মৃত্যুর পর বিষয় তাহার হস্তগত হইবে; আর সম্প্রতি কেবল কারবার ও টাকা লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অনেকে ইহা পাইলেই আপনাকে ধন্য মনে করিত, কিন্তু দুষ্টমতি নরেন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারবারের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ আশাজনক বটে; কিন্তু এই অট্টালিকা ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি সে বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে, এই লাভজনক ব্যবসা হইতে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ন্যায় সেও বিস্তর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু এই বিশাল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী ত হইতে পারিবে না; উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব অমিয় তাহা ভোগ করিবে এবং জমিদার অমিয়কুমারের সহিত ব্যবসায়ী নগণ্য নরেন্দ্রনাথের বিস্তর পার্থক্য রহিয়া যাইবে!

তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এই খামখেয়ালী কার্য্যের জন্য মনে মনে তাহার বড়ই রাগ হইল। এই ক্রোধ তাহার পাংশু গণ্ডস্থলে ও উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়ে স্পষ্ট লক্ষিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মৃত্যুর পর নরেন্দ্র তাঁহার স্থান অধিকার করিলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। কিন্তু অমিয় যূথিকাকে বিবাহ করিবে, এই ভবনে সুখে বাস করিবে, তাহাদের পুত্র জন্মিলে সে আবার উত্তরাধিকার-সূত্রে

এই বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে; আর সে এই সবের উন্নতি প্রয়াসে কত না কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে, কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, বৃদ্ধের প্রাণপণ যত্নে সেবা করিয়াছে, এ সবই বিফল হইবে। এই চিন্তাই তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য হইয়া উঠিল!

সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নরেন্দ্র ঘরের ভিতর ঢুকিলে বলিলেন, "এত দেরী হয়ে গেল!"

তাঁহারা দুইজনে আহারে বসিলেন। জ্যোতির্ম্ময় বাবু অতি অল্পই আহার করিলেন। আহারান্তে তিনি নরেন্দ্রকে বলিলেন,—"চল, বৈঠকখানা ঘরে যাই, তোমার সঙ্গে অন্যান্য কথা আছে।" নরেন্দ্র হস্তমুখ ধৌত করিয়া বৈঠকখানা ঘরে খুল্লতাতের অনুসরণ করিলে, জ্যোতির্ম্ময় বাবু কারবার, ব্যবসা, বিষয় সম্পত্তি, এই সব বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি হঠাৎ একবার উঠিয়া গেলেন। দু'এক মিনিট পরে হাতে দুইখানি দলিল লইয়া ঘরের ভিতর পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন।

নরেন্দ্র দলিল দুইখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। তাহার ভয় হইল, পাছে তাহার মুখে এমন কোন চিহ্ন প্রকাশিত হয় বা সে এমন কোন বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলে, যাহাতে তাহার মনের ভাব ধরা পড়িয়া যায়। সে বারাণ্ডার এদিক ওদিক পাইচারি করিতে লাগিল। আর মধ্যে মধ্যে বৈঠকখানা ঘরের জানালা দিয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু সম্মুখস্থ টেবিলের উপর দলিল দু'খানি রাখিয়া

চেয়ারে বসিয়াছিলেন। নরেন্দ্র একবার ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময় বাবু নিশ্চল অবস্থায় বসিয়া আছেন।

এই দৃশ্যে নরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময় বাবু গভীর নিদ্রায় অভিভূত; তখন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধের জীর্ণ মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া দলিলের দিকে তাকাইল। কিছুক্ষণের জন্য সেখানে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের নিকট গিয়া নত হইয়া দলিলপত্র দেখিতে লাগিল। একখানি দলিল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর হাতের ভিতর ছিল, তাহাতে লেখা ছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানে নরেন্দ্রই জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে; অপর দলিলে তিনি সবই যূথিকা ও অমিয়কুমারকে দান করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রের মনে সন্দেহ হইল, তবে কি বৃদ্ধ এখনও ইতস্ততঃ করিতেছে?

নরেন্দ্র ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার ভাগ্য এখন নিক্তির ওজনে ঝুলিতেছে!

জ্যোতির্ম্ময় বাবু হঠাৎ নড়িয়া উঠিলেন। যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে দরজার পাশে চলিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময় বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং উইলখানি হাতে করিয়া টলিতে টলিতে আলোর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আলোর নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি অস্ফুট স্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে পুনর্ব্বার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। পরে নরেন্দ্রের নাম ধরিয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকিলেন।

নরেন্দ্র যেন এই ঘরের ভিতর প্রথম ঢুকিতেছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া

বৃদ্ধের সম্মুখীন হইল। জ্যোতির্ম্ময় বাবু তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। নরেন্দ্র চাকরদের ডাকিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু দু' এক পদ অগ্রসর হইয়াই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই নিশ্চল মূর্ত্তি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া মেজের উপরিস্থিত দুখানি উইলের দিকে তাকাইল।

নরেন্দ্র উইল দুখানি মেজে হইতে তুলিয়া লইল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে সে একবার বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইল, তারপর আলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা মারিল। নরেন্দ্র টেবিলের উপর উইল দু'খানি রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। একজন ভৃত্য ঘরের ভিতর ঢুকিল।

"আজ্ঞে কর্ত্তার জন্য গরম জল এনেছি।" নরেন্দ্র চুপি চুপি বলিল, —"চুপ্! উনি ঘুমুচ্ছেন। জল আমার হাতে দিয়ে যা।"

নরেন্দ্র জলপাত্র লইয়া গিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময় বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় নরেন্দ্রের মুখের উপর নিবদ্ধ। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আজ্ঞে আপনার জল এনেছে।"

বৃদ্ধ জলপাত্র একদিকে সরাইয়া রাখিলেন। তিনি টেবিল হইতে একখানি উইল তুলিয়া লইয়া আলোর দিকে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইলেন। নরেন্দ্র নিমেষের মধ্যে তাহার সম্মুখীন হইল এবং উইলখানি আগুনে পুড়াইবার পূর্ব্বেই সে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ফেলিল এবং উইলখানি ছিনাইয়া লইল। তারপর মাংসখণ্ড হইতে বঞ্চিত কুকুরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে দ্বিতীয় উইলখানি টেবিল হইতে টানিয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলিল।

জ্যোতির্ম্ময়বাবু রাগে চেঁচাইয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রকে সজোরে আঁকড়াইয়া তাহার হাত হইতে অপর উইলখানি কাড়িয়া লইলেন। তিনি

হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিলেন,—"নরেন! বিশ্বাসঘাতক, বদ্‌মায়েস! এখন তোকে বেশ চিন্‌তে পেরেছি। অকৃতজ্ঞ! আমার পুত্রের সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নেবার ইচ্ছে? তা কখনই হবে না। এখনও সময় আছে। আমি তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেব।" তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তিনি পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। শেষ উইলখানি তখনও তাঁহার হাতের মধ্যে ছিল।

নরেন্দ্র বৃদ্ধের দেহের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ঘরের মেজের উপর তাকাইল। ভস্মীভূত উইলের ছাই গুলো তখন বাতাসে উড়িতেছিল। সে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, তাঁহার মাথা বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িল; তিনি চেয়ারের উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শরীর অসাড়—হিম। নরেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, বৃদ্ধের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সে হাসিতে লাগিল,—"এখনও সময় আছে, নয়? শাস্তি দেবে, কেমন?" সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যু তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গেল।

সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মৃত ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। তখন সে আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁরাণ্ডায় চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই এক ভৃত্য ভয়-বিজড়িত স্বরে নরেন্দ্রের নাম ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি দরজার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে রে?"

ভৃত্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, কর্ত্তাবাবু বোধ হয় মারা গেছেন!"

ভৃত্যের চীৎকারে বাড়ীর আর সকলেও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাকর বাকরেরা চেয়ারের চারিধারে দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ভৃত্য বলিতে লাগিল,—"আর কোন আশা নেই। এ আশ্চর্য্য রকমের মৃত্যু! ওঁর হাতে কি একটা রয়েছে দেখুন দেখি?"

নরেন্দ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার হরনাথবাবু ভিড় ঠেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধের দিকে একবার মাত্র তাকাইয়া তিনি মাথা নাড়িলেন। পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন,—"এঁকে ঘরে নিয়ে যাও, আমি জানতাম যে এঁর শরীর-গতিক বড়ই খারাপ। ইহার জন্য মন বড় উদ্বিগ্ন ছিল, তাই সংবাদ নিতে এসেছিলাম। আমার জানা ছিল, এ রকমেই এঁর মৃত্যু হবে।—কি করছিলেন?"

নরেন্দ্র মাথা নাড়িল। কর্কশ-স্বরে এলোমেলোভাবে উত্তর করিল,—আমি—আমি কিছুই জানি নি। আমি বাইরে পাইচারি করছিলাম—এটা দেখছি দলিল—আপনি কি এটা নেবেন?—আমি—আমার এটা হাতে করা উচিত নয়।"

ডাক্তার বাবু অতি কষ্টে মৃতের শক্ত আঙ্গুলগুলি খুলিয়া উইলখানি বাহির করিয়া লইলেন। নরেন্দ্র কম্পিত-স্বরে বলিল,—"ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"না, এটা উকিল গোপাল বাবুকে পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।"

নরেন্দ্র উদাসভাবে "হাঁ" বলিল এবং তৎক্ষণাৎ একজন চাকরকে উইল সমেত গোপালবাবুর বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে সমস্ত বাড়ী গম্ভীর নিস্তব্ধতা ধারণ করিল। নরেন্দ্র আলোর পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ রুক্ষ ও বিবর্ণ, দেহ অবসন্ন। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে চেয়ারের দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন খুল্লতাতের মৃতদেহ এখনও সেখানে বসান রহিয়াছে। তারপর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আরামজনক এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যে উইলের বলে সে এখন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বিশাল সম্পত্তি ও অগাধ ধনরত্নের অধিকারী, সেই উইল এতক্ষণে নিশ্চয়ই গোপাল বাবুর হাতে গিয়া নিরাপদে পৌঁছিয়াছে!

* * * * *

যথাসময়ে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মৃতদেহের সৎকার হইল। এখন এক ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত আত্মীয় বলিতে তাঁহার আর কেহই ছিল না। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ, কারবারের লোকেরা সকলেই দল বাঁধিয়া শ্মশানে তাঁহার মৃতদেহের অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ এই সদাশয় ব্যক্তি, যদিও কাজের সময় খুব কড়া লোক ছিলেন বটে, তথাপি দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানেই অর্থ-সাহায্য ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে তাঁহার সদ্‌গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য যথার্থই শোক করিয়াছিল। মৃতদেহের সৎকার হইয়া গেলে, জনতা ভাঙ্গিয়া গেল। উইলের কথা ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকেই মৃত ব্যক্তির উইলের বিষয় অবগত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত-চিত্তে তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইলেন।

নরেন্দ্রের জীর্ণ ও পাংশু বদনমণ্ডল দেখিয়া উপস্থিত সবাই স্থির করিলেন যে, খুল্লতাতের মৃত্যুতে সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বর, কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেরই মনে হইল, সে যথার্থই গভীর শোকাচ্ছন্ন। সে গোপালবাবুর ডানপাশেই বসিয়াছিল। ডাক্তার বাবু, চাকর বাকর, কারবারের লোকজন প্রভৃতি যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। সকলেই ভাবিতেছিল উইলে নরেন্দ্রের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃদ্ধ উকিল গোপালবাবু শান্ত, ধীর ও স্বল্পভাষী। তিনি নরেন্দ্রকে উইল সম্বন্ধে কেবল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৈঠকখানা ঘরে যাইবার পথে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরেন্দ্র বাবু, আপনি কি জ্যোতির্ম্ময় বাবুর উইলের সারমর্ম্ম কিছু জানেন?" নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া ধীর ও উদাসীন ভাবে উত্তর করিল,—"না; তিনি কখনও আমার নিকট ও সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না।"

গোপালবাবু তাঁহার কথা ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিলেন। উপস্থিত সকলেই স্থির হইয়া বসিল। গোপালবাবু স্বাভাবিক ধৈর্য্যসহকারে উইলখানি সর্ব্বসমক্ষে বিস্তার করিলেন এবং "ইহা জ্যোতির্ম্ময় বাবুর উইল আমিই ইহা লিখেছিলাম," এইরূপ সূচনা করিয়া ধীর স্পষ্ট স্বরে উইলখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

নরেন্দ্র হাতে মাথা রাখিয়া সম্মুখে হেলিয়া বসিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নিম্নগামী। সে বাহ্যতঃ শান্ত ও সংযত মূর্ত্তি ধারণ করিলেও তাহার

হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল এবং মস্তিষ্ক গভীর চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল।

উইলে সকলকেই জ্যোতির্ম্ময় বাবু কিছু কিছু দিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহাকেও বাদ দেন নাই। কারবারের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, বাড়ীর চাকর, ডাক্তার, উকিল কাহাকেও তিনি কিঞ্চিৎদানে বঞ্চিত করিয়া যান নাই। স্থানীয় দাতব্য সভা সমিতিতেও বিস্তর টাকা দিয়া গিয়াছেন।

নরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া এই সব শুনিতে লাগিল। কখন তাহার নাম উচ্চারিত হইবে?

গোপালবাবু কোথাও না থামিয়া পড়িতে লাগিলেন। পাঠ শেষ হইয়া গেলে সমবেত লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। সকলেই বিস্মিত নেত্রে নরেন্দ্রের দিকে চাহিল; নরেন্দ্র একটু চমকিয়া উঠিল।

নির্ব্বোধ বৃদ্ধ কি পড়িতেছে? সে উইলের আসল অংশ পড়িতেছে না কেন? যে অংশে লেখা আছে, নরেন্দ্র বৃদ্ধের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবে, সেই অংশটুকু পড়িতেছে না কেন? কেন সে "যূথিকা" "আমার পুত্র অমিয় কুমার" এই সব বাজে নাম উচ্চারণ করিতেছে? যে স্বর এতক্ষণ নরেন্দ্রের কর্ণকুহরে কর্কশভাবে বাজিতেছিল, তাহা হঠাৎ থামিয়া গেল। গোপালবাবু নরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন। নরেন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে সবাই তাহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে; সে মাথা তুলিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিতে লাগিল যেন উকিলকে জিজ্ঞাসা করিতে চায় "আপনি মধ্যপথে থামলেন কেন? পড়ুন।"

গোপালবাবু স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন।

তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি উইলের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারলেন ?"

নরেন্দ্র কর্কশ স্বরে উত্তর করিল "না।" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গমনোদ্যত ব্যক্তিগণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইল।

গোপাল বাবু উইল হাতে করিয়া পুনর্ব্বার প্রয়োজনীয় অংশটুকু পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উকিলের দিকে উদাসীনভাবে তাকাইয়া হাসিয়া উঠিল। এই অট্টহাস্য শুনিয়া সবাই চমকিত হইল। হাস্যে উন্মত্ততার চিহ্ন বর্ত্তমান! তারপর সে পুনর্ব্বার চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং শূন্য-দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল, কাহারও কথা শুনিল না, কোন লোক বা জিনিষের দিকে চাহিল না। তবে একটা বিষয় সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, ভ্রমবশতঃ প্রয়োজনীয় উইলখানিই সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

(২)

"ইহা অসম্ভব—অস্বাভাবিক!" যুথিকার এই স্পষ্ট সুমিষ্ট কথাগুলি সমস্ত ঘরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার তন্বী আকৃতি তীরের ন্যায় ঋজু হইয়া উঠিল। তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। গোপালবাবু তাহার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

যুথিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি উইল ঠিক পড়েছেন? এ যেন অত্যদ্ভুত উপন্যাসের ঘটনার মত বোধ হচ্ছে। আপনি

বলতে চান যে, জ্যোতির্ম্ময় বাবু আমাকে এই সর্ত্তে বিষয় দিয়ে গেছেন যে, আমি—আমি—ওঃ! এ কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না।"

গোপাল বাবু ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, যা বললাম সব সত্যি। আমি আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছি, এ ত বিস্মিত হবার কথাই! উইল আমিই লিখেছিলাম। এ বিষয়ে আমার কোন হাত নেই, এ রকম উইল করতে জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি শোনেন নি। এখন এর বিরুদ্ধে কাজ করা আমাদের সাধ্যাতীত।"

যূথিকা তাড়াতাড়ি বলিল,—"কেন, আমি কি এই উইলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে পারি না? সে ত আমারই ইচ্ছাধীন। আপনাকে বোধ হয় আর বলতে হবে না যে, উইলের এই অস্বাভাবিক সর্ত্ত পালন করতে আমি সম্পূর্ণ নারাজ।"

গোপাল বাবু উইলটি আঙ্গুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"আপনি এর সর্ত্ত অনুসারে কাজ করতে পারবেন না?"

যূথিকা দৃঢ়-স্বরে উত্তর করিল,—"না।" তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল; চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। "জ্যোতির্ম্ময় বাবু খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। কারবারের সামান্য কাজ থেকে তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমাদের পৈত্রিক অট্টালিকা, বিষয় সম্পত্তি সবই একে একে তিনি কিনে নিয়েছিলেন। অর্থের দ্বারা বিষয় সম্পত্তি কিনতে পারেন বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আমায় কাজ করাতে পারেন না।"

গোপাল বাবু উইলখানি নাড়িতে লাগিলেন। তাহাকে আর কিছু বলিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এ সময় মনের ভাব প্রকাশে ইহাকে বাধা

দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি যূথিকার সুন্দর নেত্রপ্রান্তে দু' এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুও লক্ষ্য করিলেন। যূথিকা কম্পিতস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যদি আমার অবস্থায় পড়তেন, তা হ'লে কি করতেন? পুত্রের প্রতি পিতার বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করবার উপলক্ষ হতে আপনি ইচ্ছা করেন কি?"

গোপাল বাবু কাসিতে কাসিতে বলিলেন,—"আমার মনে হয় না, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এ রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল।"

"ইচ্ছা ছিল না, তা আমরা কেমন করে বলতে পারি; তাঁর কাজ দেখে ত আমার তাই মনে হয়। তিনি আমাকে এবং তাঁর পুত্রকে পরস্পরের নিকট দাসত্বে বিক্রয় করে গেছেন; মনে করেছিলেন অর্থের লোভে, মানসিক দৌর্ব্বল্য-বশতঃ আমরা এই আত্ম-বিক্রয়ে সম্মত হবো, ইহাই উইলের মর্ম্ম।" সে দৃঢ়ভাবে এই সব কথা বলিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। "আমি উইল অনুসারে কাজ করতে এখনই স্পষ্ট অস্বীকার করছি। আমাকে এক টুকরা কাগজ ও কলম দিন, আমি সেই মর্ম্মে লিখে দিই।"

গোপাল বাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আপনার মতামতের এখন কোন প্রয়োজন নেই। উইলের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অমিয়কুমার যদি আপনাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব উত্থাপন করে, আপনি ইচ্ছা করলে, তাতে অস্বীকৃত হতে পারেন! তখন এ সম্পত্তিতে আপনার আর কোনও স্বত্ব থাকবে না। এখন এ সমস্ত সম্পত্তিই আপনার অধিকারে, পরেও থাকবে। এই হচ্ছে উইলের মূল কথা।"

যূথিকা নিরুপায় হইয়া বলিল,—"জ্যোতির্ম্ময় বাবু তা হ'লে দেখছি সব বিষয়েই ভেবে উপায় ঠিক করে গেছেন। আমি যেন পাখীর মতন জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তাঁর পুত্র এখন কোথায়?"

"অমিয়কুমার সিংহলের অন্তর্গত কলম্বো নামক স্থানে আছে, সংবাদ পেয়েছিলাম; আমরাও অবশ্য তাঁকে সেখানে পত্র দিয়েছি।"

"তিনি এবার বোধ হয় বাড়ী ফিরে আসবেন। কত শীঘ্র আসবেন বলতে পারেন? কিন্তু তিনি যতদিন না আসেন, আমি এবাড়ীতেও থাকতে পারব না।"

গোপাল বাবু অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আশা করি আপনি ভেবে চিন্তে কাজ করবেন। তা না হ'লে আমার ভার আরও গুরুতর হয়ে পড়বে। অমিয়কুমার অবর্ত্তমানে আপনিই এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।"

"নরেন্দ্র বাবু কোথায়?"

"কারবারের কুঠিতে। জ্যোতির্ম্ময় বাবু এ অট্টালিকা কেনবার পূর্ব্বে যে বাড়ীতে থাকতেন, এখন তিনি সেখানেই আছেন।"

"তিনি আমাদের এ কার্য্যে সহায়তা করবেন না?"

গোপাল বাবু মাথা নাড়িলেন। "আমার মনে হয়, তিনি কোন সাহায্য করবেন না। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর হতেই তিনি অসুস্থ হন। অসুস্থতার কারণ—বোধ হয় মানসিক উত্তেজনা ও চিন্তা। সম্প্রতি তিনি একটু সুস্থ হয়ে কারবারের কাজে মন দিয়েছেন। সেই কারবারের তিনিই এখন স্বত্বাধিকারী। আমাকে জানিয়েছেন, এ কাজে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।"

যূথিকা একটু দুঃখিত হইয়া বলিল,—"বোধ হয় উইলের মর্ম্ম অবগত হয়ে লজ্জায় এর সঙ্গে তিনি কোন সম্বন্ধ রাখতে চান না। আমাদের সাহায্য করবার দেখছি আর কেউই নেই—এ কথা সত্যি; কারণ আপনিও বোধ হয় আমাকে এ গুরুতর বিষয়-কার্য্যে সাহায্য করতে সম্মত নন?"

"আমার কোন দোষ গ্রহণ করবেন না। যতদূর সাধ্য, আমি আপনার সাহায্য করব। কিন্তু আমি উইলের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে পারব না।"

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। বছর সতর বয়সের একটী মেয়ে যূথিকার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। যূথিকা বেলার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ও বাল্যকাল হইতেই দুইজনে পরস্পরের খেলার সঙ্গিনী বলিয়া, বেলা মধ্যে মধ্যে স্নেহভরে দিদির নাম ধরিয়াও ডাকিত। তাহার নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠের উপর বিস্তৃত। গোপাল বাবুকে ঘরের ভিতর দেখিয়া সে থামিয়া গেল। পরে ঘরের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকার গলা জড়াইয়া হতভাগ্য উকিলের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল,-
"আপনি দিদিকে কি বলছিলেন? সে কাঁদছে কেন?" পরে দিদির দিকে করুণভাবে চাহিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল,—"কি হয়েছে দিদি? ইনিই বা কে?"

বালিকা তাহার দিদির কাছে গিয়া বসিল। গোপাল বাবু কাগজ পত্র সব গুছাইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"আমি তোমার দিদিকে বিপদ হতে উদ্ধার-লাভের উপায় নির্দ্দেশ করছিলাম, এই

আমার দোষ।” অতঃপর তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি সে ঘর ত্যাগ করিলেন।

বেলা তাহার দিদির মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া তাহার কুঞ্চিত কেশদাম আদরের সহিত নাড়িতে লাগিল। পরে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল. “ঐ বুড়ো লোকটি তোমাকে কি বলছিল? আমরা এ বাড়ীতেই বা কেন এসেছি, দিদি? এ সকলের অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“এর মানে—জ্যোতির্ম্ময় বাবু আমাকে তাঁর বাড়ী, ঐশ্বর্য্য, বিষয় সম্পত্তি সব দান করে গেছেন। বেলা, গোপাল বাবু আমাকে এ সব গ্রহণ করতে বল্‌ছিলেন।”

বেলা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দিদির রক্তাভ বদনমণ্ডল ও উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়ের দিকে তাকাইল। পরে ধীরে বলিল,—“তাহলে ত গোপাল বাবুর প্রতি আমি অন্যায় করেছি দেখছি। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি বোকার মত কাজ করতে উদ্যত হয়েছ!”

“বেলা, তুমি ছেলে মানুষ, ভিতরকার কথা সব বুঝতে পারবে না।”

বেলা যূথিকাকে নিজের কাছে টানিয়া ভগিনী-সুলভ স্নেহমাখা-স্বরে উত্তর করিল,—“আমিই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ব্যাপার কি। জিজ্ঞাসা করলাম কেন কাঁদছো, তুমি বল্‌লে জ্যোতির্ম্ময় বাবু তোমাকে বিষয় সম্পত্তি দান করে গেছেন, তুমি সেই সব গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এই কথা শুনেই স্বভাবতঃ আমি একটু বিস্মিত ও রাগান্বিত হয়েছি।”

যূথিকা চোখের জল মুছিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া বলিল,—“জ্যোতির্ম্ময় বাবু যে কেবল বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন তা নয়, আমার জন্যে একটী স্বামীও নির্ব্বাচিত করে রেখে গেছেন।”

"সত্যি? তুমি ঠিক জান, তিনি দুজন লোক ঠিক করে যান নি? আমার জন্যে একজন? জানতে পারি, সে ভাগ্যবান্ যুবক কে?"

"তাঁর পুত্র অমিয়কুমার।"

"তা তুমি কাঁদছ কেন?"

"বেলা, এ বড়ই লজ্জার কথা! তিনি জ্যোতির্ম্ময় বাবুর একমাত্র পুত্র। জ্যোতির্ম্ময় বাবু আমার নামে যা উইল করে গেছেন তা গ্রহণ করলে, তাঁকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা হতে বঞ্চিত করা হয়। অবশ্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তির লোভে বিবাহে সম্মত হলেও, আমি তাঁকে বিবাহ করতে অস্বীকার করব। বিষয় সম্পত্তি তখন তাঁর হবে এবং গোলমালও সব মিটে যাবে।"

বেলা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "সব ঠিক ঠাক হবে বটে, কিন্তু তোমার তাতে কি লাভ? আচ্ছা, জ্যোতির্ম্ময় বাবু এ বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করেন নি? ধর, অমিয়কুমারও হয় ত তোমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করতে পারেন।"

"তিনি নিশ্চয়ই বিবাহে অসম্মত হবেন। তখন এই সম্পত্তি আমিই যাবজ্জীবন ভোগ করবো।"

বেলা পুনর্ব্বার মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইল। পরে আবার বলিয়া উঠিল, "দিদি, অমিয়কুমার দেখতে কেমন?"

যূথিকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি জানি না; সেই ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলাম, আর দেখি নি। তাও তখন দু'একবার মাত্র আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি বিদেশে ইস্কুলেই পড়তেন, ছুটির সময় যখন বাড়ী আসতেন, তখন আমরা বাবার সঙ্গে এ দেশ ত্যাগ করে বিদেশ-

ভ্রমণে বাহির হতাম। এখন তাঁকে দেখলে আমি চিনতে পারব না। গোপাল বাবু বলছিলেন, তিনি এখন সিংহলে আছেন।"

বেলা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি দেখতে কেমন ছিলেন?"

যূথিকা এই প্রশ্নে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"তা কি আমার মনে আছে? বোধ হয় ছেলেবেলায় তিনি দেখতে বেশ সুশ্রীই ছিলেন।"

"জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ঘরে একখানা ফটো দেখে এলাম; সে ফটো যদি তাঁরই হয়, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই একজন সুপুরুষ। দিদি, আমি বাড়ীর সর্ব্বত্রই ঘুরে এসেছি,—বড় বড় ঘর, প্রকাণ্ড হল, কত আসবাব, দাস দাসী, কি সুখের স্থান! এ সব এক সময় আমাদেরই অধিকারে ছিল—নয় দিদি? কেমন করে আমাদের নষ্ট হয়ে গেল?"

"আমরা এ সব হারাই নি, বিক্রয় করেছিলাম" যূথিকা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল। সে তখন সেই অদ্ভুত উইলের কথাই চিন্তা করিতেছিল।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বিক্রয় হলো?"

যূথিকা তাহার সুগঠিত কোমলহস্তে মসৃণ কেশরাশি কপোলদেশ হইতে সরাইয়া বলিল,—"সে অনেক দিনের কথা। ব্যবসায়ে আমাদের বড় লোকসান হয়। তাই বাবা বাধ্য হয়ে এই বিষয় সম্পত্তি জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে বিক্রয় করেছিলেন।" এই বলিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার কহিল,—"বেলা, তুমি বুঝতে পারছো না। এ রহস্য বোঝবার তোমার এখনও বয়স হয় নি।"

বেলা চেয়ার হইতে উঠিল। কোমরে হাত দিয়া দাড়াইয়া স্থিরভাবে দিদির মুখের দিকে তাকাইল। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিয়া বেলার মনে করুণার উদ্রেক হইল; সে বলিতে লাগিল,—"তুমি কি আমাকে

ছেলে-মানুষ ভাব? আমাদের সেই পুরাতন বাসাবাটীর অপেক্ষা এই অট্টালিকা পছন্দ করবার বুদ্ধি আমার যথেষ্ট আছে। এই সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ হতে বহুমূল্য পোষাকের পার্থক্য আমি বেশ বুঝতে পারি। এই সুন্দর পরীরাজ্যই তোমার ন্যায় সুন্দরী যুবতীর উপযুক্ত বাসস্থান! আমি যে তোমাকে নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করতে বারণ করছি, তাতে আমার পূরোদস্তর স্বার্থ আছে। আমি এখানেই আজীবন থাকতে ইচ্ছা করি। আর আমাদের এখানে থাকবার অধিকারও হয়েছে।"

"বেলা, আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি শোন। আমি সুবিধা পেলেই যতশীঘ্র পারি অমিয়কুমারকে জানাবো, তিনি যথাসময়ে আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করবেন; তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। আমি তখন বিবাহে অসম্মত হব। তা হ'লেই সব গোল চুকে যাবে। তিনিও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবেন, আমিও এ বিপদ হতে মুক্ত হব। মনে করো না, এ সম্পত্তি আমরা চিরদিন সুখে ভোগ দখল করতে এসেছি। যতদিন একটা ব্যবস্থা না হয়, ততদিন তাঁর হয়ে আমিই যথাসাধ্য এই বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করব। সেটাও আমার কর্ত্তব্য!"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় কে ধাক্কা মারিল। ভৃত্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "নরেন বাবু এসেছেন, দেখা করতে চান।"

যূথিকা একবার ভৃত্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বেলার দিকে চাহিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন এ সংবাদে সে একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। বেলা স্থিরভাবে বলিল,—"নরেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এস; দিদি, তুমি ভাল হয়ে বস।"

যূথিকা চোক মুখ মুছিয়া, পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। নরেন্দ্র ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেদিন যেন তাহাকে স্বাভাবিক অপেক্ষা আরও একটু বেশী রোগা দেখাইতেছিল এবং তাহার পাংশুবদন আরও বিবর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যূথিকাকে অভিবাদন করিল। তাহার মুখের ভাব ও চালচলন দেখিয়া ভগ্নীদ্বয়ের মনে হইল যেন সে সর্ব্বদাই সতর্ক রহিয়াছে এবং প্রত্যেক কথাবার্ত্তা অতি সাবধান হইয়া বলিতেছে।

নরেন্দ্র বলিল,—"আপনারা কোন ক্রটি গ্রহণ করবেন না, আপনাদের অনুমতি না নিয়েই আমি এ বাড়ীতে এসেছি। আপনারা বোধ হয় এখানে বেশী দিন আসেন নি; কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যতশীঘ্র সম্ভব দেখা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। শরীর অসুস্থ না হলে আরও পূর্ব্বে আমি আসতে পারতাম। রোগের পর আমি এই আজ প্রথম বাড়ীর বার হয়েছি।"

তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু ও সুশ্রাব্য, স্থান কাল ও পাত্রের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়াই মনে হইল।

যূথিকার অসংযত কেশরাশি তাহার গণ্ডস্থলে উড়িয়া পড়িতেছিল। সে কেশরাশি সংযত করিয়া বলিল,—"আপনার অসুখের কথা শুনে আমরা বড়ই দুঃখিত; আপনি যে দয়া করে এসেছেন, তার জন্য আমরা বিশেষ বাধিত।"

বেলা কিছুই বলিল না। চেয়ারের উপর বসিয়া সম্মুখস্থ টেবিলে যষ্টির দ্বারা মৃদু প্রহার করিতে লাগিল।

যূথিকা নরেন্দ্রকে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল। নরেন্দ্র চেয়ারের উপর বসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল,—"গোপাল বাবু আপনাকে নিশ্চয়ই উইলের কথা সব বলেছেন। আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি আপনাকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে ইচ্ছে করি। আমার মনে হয়, বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করা আপনার পক্ষে একটু জটিল ও কষ্টকর বলে বোধ হবে। আপনার কোন সাহায্য করতে পারলে আমি বড়ই আনন্দিত হব। আপনি বোধ হয় জানেন যে, আমার খুড়োর সঙ্গে কয়েক বৎসর একত্রে আমি কাজ করেছিলাম। বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতাও আছে।"

নরেন্দ্রের কথা শেষ হইলে যূথিকা বলিল, "নরেন্দ্র বাবু, আপনার এই সদয় ব্যবহারে আমরা বড়ই মুগ্ধ হয়েছি। আপনার সাহায্য পেলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।"

নরেন্দ্র তখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

যূথিকা তাহাতে বাধা দিয়া বলিল,—"আর একটু বসুন, চা খেয়ে যান।"

সে একটু ক্ষীণভাবে হাসিয়া উত্তর করিল,—"না, মাফ্ করবেন, আমাকে কারখানার কাজে যেতে হবে। গোপাল বাবু নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন যে, কারবারের আমিই এখন সত্বাধিকারী।"

নরেন্দ্র ভগ্নীদ্বয়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যূথিকা দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। বেলা তখন উঠিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল —"আঃ গেল, বাঁচা গেল!"

যুথিকা তাহার দিকে চমকিয়া চাহিল। সে একটু রাগান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বেলা, ও কথা বলছো কেন?"

বেলাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—"তিনি চলে গেছেন, আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। দিদি, ও লোকটাকে আমার আদৌ পছন্দ হয় না।"

(৩)

সন্ধ্যা আগত প্রায়। একজন যুবক সিংহলদ্বীপের এক উপত্যকা-মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল।

সবুজবর্ণ পত্র-পল্লব-শোভিত বৃক্ষ-বেষ্টিত উপত্যকাভূমি একটু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গদেশ মেঘমুক্ত, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিপাতে সুবর্ণ-প্রভায় রঞ্জিত। পথিক কিন্তু স্বভাবের সেই চারু শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না; অনাহারে জঠর-জ্বালা সহ্য করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যুবক যে কেবল ক্ষুধার্ত্ত তাহা নহে, সে পথভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছিল এবং আজ যে সে কি আহার করিবে বা কোথায় আশ্রয় লইবে, তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই!

যুবক দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহ সুগঠিত, স্কন্ধদ্বয় বিশাল। তাহার আকৃতিতে সাহস ও দৃঢ়তা, ক্ষিপ্রতা ও কমনীয়তা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ক্লান্তচরণে অতিকষ্টে সে বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতেছে। সত্যই সে আজ আশ্রয়হীন ভিখারী, কিন্তু তাহার আকৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, সে একজন সাধারণ-ভিক্ষুক-দলভুক্ত নহে।

তাহার মুখখানি বেশ সুন্দর। চক্ষুর্দ্বয়ে দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতা মাখান

রহিয়াছে। যুবকের আকৃতিতে এমন একটা ভাব রহিয়াছে যে, রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার সময় সকলের দৃষ্টিই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তাহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ, তাহাও আবার ছিন্ন। যুবক তাহার স্কন্ধের উপর লাঠির প্রান্তে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বাঁধিয়া পথ চলিয়াছে। প্রাতেই গত রাত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে সমস্তদিন সে কিছুই আহার করে নাই। এরূপ অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ একটু অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু এই যুবকের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল। তাহার মনেও বিপুল সাহস ও অদম্য তেজ ছিল।

রাস্তার মোড় ঘুরিয়া সম্মুখে সে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। স্ত্রীলোকটী তাহার অপেক্ষা আরও ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তাহার গতি দেখিলে মনে হয় যে, সে বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। তাহার বস্ত্রাচ্ছাদিত মস্তক বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মূর্ত্তিতে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব জড়িত রহিয়াছে। সে যেন হাতে কি ধরিয়া আছে। ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত পথ ধরিয়া ক্লান্ত চরণে সে চলিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন, গাছের কৃষ্ণ ছায়াগুলি তাহার দুঃখের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দিতেছে। যুবক জোরে চলিতে লাগিল। খানিকদূর গিয়া স্ত্রীলোকটী রাস্তার অপর মোড় ভাঙ্গিল। যুবক তাড়াতাড়ি সেখানে উপনীত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, স্ত্রীলোকটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সম্মুখে কোন মনুষ্যের বসতি নাই। অথচ স্ত্রীলোকটি কোথায় গেল, ইহা ভাবিয়া যুবক বড়ই বিস্মিত হইল। সে দ্রুত চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই দেখিল, স্ত্রীলোকটি পথিপার্শ্বে গাছপালার মধ্যে এক বৃক্ষের তলায় শুইয়া রহিয়াছে। যুবক বোঝা নামাইয়া তাহার নিকটে গিয়া

দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটির মাথা হইতে শীতবস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া যুবক অনুমান করিল, হিন্দুস্তানী রমণী, সম্প্রতি কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আগে সে নিশ্চয়ই বেশ সুন্দরী ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহার মুখে যন্ত্রণাভোগ ও ধ্বংসের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া যুবক বুঝিতে পারিল, স্ত্রীলোকটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। সিংহলের জনশূন্য অরণ্যের মধ্য দিয়া ভ্রমণের সময় ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল শীত লাগায় সে যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে যুবকের বিলম্ব হইল না। যুবক পথের পার্শ্বেই জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ঝরণা দেখিয়া আসিয়াছিল; সেখানে দৌড়িয়া গিয়া জল আনিয়া স্ত্রীলোকের মুখে ও চোখে ঝাপটা দিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটি একটু সুস্থ হইল, কিন্তু তাহার জীর্ণ বক্ষঃস্থ শিশুকে আর সে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। যুবক তখন হস্ত প্রসারণ করিয়া শিশুটিকে ধরিয়া ফেলিল। মৃত্যুর তুষার-শীতল হস্ত-স্পর্শে শিশুর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যুবক তাহার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিল। মনোমধ্যে উদিত নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে সে স্ত্রীলোকটির পার্শ্বেই ভূমির উপর মৃত শিশুটিকে রাখিল। স্ত্রীলোকটি প্রথম চক্ষু খুলিয়াই শিশুর দিকে তাকাইয়া অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"শেষ হয়ে গেছে?"

যুবক কিছু উত্তর না দিয়া শিশুটিকে তাহার বক্ষে তুলিয়া দিল। রমণীর শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সেই অশ্রু তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া বক্ষঃস্থ শিশুর মুখমণ্ডলে পড়িল। তারপর হঠাৎ সে চক্ষের জল মুছিয়া যুবকের করুণাবিগলিত চক্ষুর দিকে তাকাইয়া মৃদু-স্বরে বলিল,—

"মারা গেছে দেখে আমি বড় সুখী! জন্মাবধি যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এর মরাই ভাল। কয়েক দিন ধরে কিছু খেতে পায় নি। মা হয়েও আমি মনে মনে সন্তানের মৃত্যুকামনা করে এসেছি, ঈশ্বরের নিকট কতবার প্রার্থনা করেছি —"

তাহার কণ্ঠস্বর আবার রুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দুটি পুনর্ব্বার বর্ষণোন্মুখ হইল; কিন্তু সে অশ্রুপ্রবাহে বাধা দিয়া উদাসভাবে সম্মুখে তাকাইয়া রহিল।

যুবক একটি নারিকেল-গাছে হেলান দিয়া বসিয়াছিল; ভাবিল এ অবস্থায় সন্তানহারা জননীকে কিছুক্ষণ শোক করিতে দেওয়া উচিত। অপর কারণেও সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির অবস্থা দেখিয়া যুবকের মনে সন্দেহ হইল, কেহ বোধ হয় তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে।

যুবক কোমল কণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আর একটু পথ হাঁটতে পারবে বলে মনে কর? আধ ক্রোশ পরে মনুষ্য-বসতি আছে। আমি সেখানে যাচ্ছি, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

স্ত্রীলোকটি উন্নত দৃষ্টিতে যুবকের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর উঠিবার চেষ্টা করিল। যুবক তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃত শিশুটিকে নিজে বহন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

কিন্তু সে তাহার মাথা নাড়িয়া যুবকের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইল এবং শিশুটিকে আরও জোরে তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোকটি যুবকের সাহায্যে অনেক কষ্টে একটু অগ্রসর হইল। তারপর ভারবহনে অসমর্থ হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুটিকে যুবকের হাতে তুলিয়া

দিল। নিঃশব্দে মন্দগতিতে কিছুদুর চলিয়া তাহারা এক মনুষ্যাবাস দেখিতে পাইল। যুবক স্থানটি বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া বুঝিল, এই বাড়ীরই সন্ধানে সে আসিয়াছে।

স্থানটি বেশ শান্ত ও আরামপ্রদ। সম্মুখের বাগানে নানা রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সুগন্ধে প্রাণ আমোদিত হইতেছে। বাড়ীর গায়ে লতা-গাছ জড়াইয়া ঠিক যেন কুঞ্জবনের মত দেখিতে হইয়াছে। দরজায় একজন স্থূলকায় সিংহলদেশীয় পুরুষমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া ছিল। দুইজন পথিককে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ফটকের নিকট আসিল।

যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই বাড়ীর কর্ত্তাই কি আপনি? আমি শুনেছিলাম আপনাদের চা বাগানে একজন লোকের দরকার। মশায়ের নামই কি দেবপাল সিং?"

দেবপাল ঘাড় নাড়িল। পরে মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে একবার যুবকের দিকে একবার স্ত্রীলোকটীর দিকে তাকাইল। স্ত্রীলোকটি তখন ফটকের খুঁটিতে হেলান দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছে।

দেবপাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হা, আমাদের চা বাগানে একজন লোকের দরকার বটে, কিন্তু আমরা কেবল একজন পুরুষ মানুষ চাই।"

যুবকের মুখ একটু আরক্ত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—"এই স্ত্রীলোকটি আমার স্ত্রী নহে।"

দেবপাল পুনর্ব্বার যুবকের প্রতি তাকাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,—

"কি করব? আমরা কেবল একজন পুরুষ মানুষই চাই। স্ত্রীলোকে আমাদের দরকার নেই।"

যুবক তখন তাহার ওষ্ঠদ্বয় দাঁতে কামড়াইতে লাগিল। পরে একবার মূর্চ্ছিত-প্রায় স্ত্রীলোকের দিকে, একবার দেবপালের উদ্বেগপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া, স্ত্রীলোকটি না শুনিতে পায় এরূপ মৃদুভাবে বলিল,—"এই স্ত্রীলোকটিকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখি। বড়ই অসুস্থ, মর মর। আপনি নিজে দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে একে কি বাড়ীতে একটু স্থান দেবেন?"

যুবতীর রুগ্ন দেহ দেখিয়া ও যুবকের অনুনয় বিনয়ে তাহার মন বিচলিত হইল বটে, কিন্তু দেবপাল তবুও কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরে রমণীর বেদনাক্লিষ্ট পাংশুবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে বলিল,—"চল, তোমরা বাড়ীর ভিতর চল।"

তাহারা একটি ঘরের ভিতর ঢুকিল। যুবক স্ত্রীলোকটিকে বিছানার উপর বসাইয়া দিল। যুবতী মৃতপ্রায় হইয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময় এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বাটীতে খানিকটা গরম দুধ লইয়া দ্রুতপদে ঘরের ভিতর ঢুকিল এবং স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিল -"খেয়ে ফেল।" পরে যুবকের সম্মুখে তাহার বাহু বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"শিশুটিকে আমার কাছে দাও।" যুবক শিশুকে তাহার হস্তে দিবার পূর্ব্বে মৃত শিশুর মুখ হইতে আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল। স্নেহময়ী রমণী সেই মৃত শিশুটিকে লইয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল এবং অস্ফুট সহানুভূতিসূচক কথায় সান্ত্বনা দিয়া যুবতীকে উঠাইয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল।

যুবকও বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, তাহাকেও কিছু খাইতে দেওয়া হইল। যুবক খাইতেছে এমন সময় দেবপাল উপর হইতে নামিয়া আসিয়া চা লইয়া তাহার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল এবং তাহার দিকে তীক্ষ্ণ অথচ করুণদৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকটি এখন এত দুর্ব্বল ও অসুস্থ যে, প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। সে অনেক কষ্টে তার নামটি বলেছে,—লুলিয়া। তোমার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিল, "হরিচরণ দাস, ডাক নাম—হরি।"

"তুমি কোথা হতে আসছ?"

"কলম্বো থেকে।"

চা পানের পর দেবপাল তাহাকে বলিল, "আমাদের একজন লোকের দরকার; তা তোমাকেই সে কাজে নিযুক্ত করতে আমরা স্থির করেছি। মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে তুমি বেতন পাবে। বোধ হয় এতে তোমার কোন আপত্তি নেই, আর আবশ্যক মত তুমি সব কাজ করতে সম্মত আছ ত?"

"মাসে পঞ্চাশ টাকা হ'লেই আমার বেশ চলবে। আর কাজের কথা যা বল্লেন, দেখবেন, আমি সাধ্যমত কোন কাজ করতে অসম্মত হব না।"

*   *   *   *

দেবপাল অতি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে হরিচরণ এক রত্ন বিশেষ। ইতিমধ্যেই চা বাগানের সব কাজ সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছে। সে এত কর্ম্মঠ ও বলবান যে, কাজ করিয়া কখনও তাহাকে ক্লান্ত হইতে দেখা যায় নাই। সকল প্রকার কাজেই সে হাসিমুখে অগ্রসর হইত. কয়েক দিনের মধ্যেই চা বাগানের সকলের সঙ্গেই তাহার বন্ধুত্ব হইল।

হরিচরণের কার্য্য-প্রণালী খুব সরল, অথচ ফলপ্রদ। যখন কোন কাজ করাইবার দরকার হইত, সে প্রথম অধীন লোকদের তাহা করিবার জন্য হাসিমুখে আদেশ করিত এবং কার্য্য সম্পন্ন হইলে প্রফুল্লবদনে তাহার অনুমোদন করিত। যদি কেহ তাহার আদেশ-পালনে বিমুখ হইত, সে পূর্ব্বের ন্যায় শান্তভাবেই তাহাকে সেই কাজ করিবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিত। কিন্তু সেবারকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেহ আর তাহার কথা অমান্য করিতে সাহস করিত না।

লুলিয়া তখনও শয্যাগত। কিন্তু দেবপালের নিকট হরিচরণ প্রত্যহই সংবাদ পাইত যে সে ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছে।

একদিন কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিচরণ দেখিল, লুলিয়া বাহুর উপর জল-ধৌত পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া বাগানের ভিতর যাইতেছে। তাহার মুখ তখনও পাংশুবর্ণ। তথাপি রাস্তার ধারে হরিচরণ তাহাকে প্রথম যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেক ভাল। কিন্তু তাহার মুখে চোখে যেন করুণ জীবন-নাট্যের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন জীবনে সে কখনও হাসে নাই। হরিচরণকে দেখিয়া সে থামিল এবং উদাসনয়নে তাহার দিকে তাকাইল। তাহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যেন সে হতভম্ব হইয়া অতীতের কোন ঘটনা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার চোখের ভাব বলিয়া দিল, যেন সে হরিচরণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক। হরিচরণ হাসিমুখে বলিল,—"তুমি শয্যা ত্যাগ করেছ দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। আশা করি, এখন বেশ সুস্থ হয়েছ।"

যুবতীর চক্ষুর্দ্বয় হরিচরণের মুখের উপর নিবদ্ধ। সে যেন একটু

চিন্তিত ও উদাসীন ভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তির ন্যায় মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"এখন ভালই আছি।"

সৌম্যমূর্ত্তি হরিচরণ বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া খাইতে বসিল। আহারান্তে গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিয়া সে তাহার কার্য্যের বিবরণী দিল। দেবপাল তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"তুমি অনেক কাজ করে এসেছ। আমি নিজে এর চেয়ে বেশী কাজ করতে পারতাম না।"

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, -"নূতন কোন সংবাদ আছে ?"

দেবপাল চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া ধূমপান করিতে করিতে বলিল,—"না, নূতন সংবাদ কিছু নেই। তবে লুলিয়া বেশ সুস্থ হয়েছে। এখন ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে।"

হরিচরণ বলিল,—"তা'হলে দেখছি আপনারা তাকে এখনও বাড়ীতে রেখেছেন।"

দেবপাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই ; তার কাছ থেকে আমরা অনেক কাজ পাই।"

হরিচরণ চিন্তিতভাবে সম্মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল, 'আপনারা তা'হলে তার পরিচয় জানতে পারেন নি, সেও এখন কিছু বলে নি ?"

দেবপাল উত্তর করিল,—"না, সে নিজেও ইচ্ছা করে কোন কথা বলে নি, আমরাও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। ও নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বেচারী নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমি আর সে সকল স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছা করি না।"

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া মনিবের প্রতি সম্মান দেখাইল। বলিল, "মহাশয়, আপনি যথার্থই উদার।"

তাহার এই উক্তি শুনিয়া দেবপাল মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। চা বাগানে কিছু কাজ ছিল। হরিচরণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্বাভাবিক তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাজে চলিয়া গেল। তাহার আকৃতিতে কি যাদুমাখান ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু সে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই সবাই বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

এমন সময় এক অধীন শ্রমজীবী দৌড়িয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, —"বাবু, বনের ভেতর একজন লোক এসেছে, লুলিয়া "

সে নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য থামিল। তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তখন অদূরে স্ত্রীলোকের চীৎকারধ্বনি বাতাসে শুনিতে পাওয়া গেল; হরিচরণ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই চীৎকার-ধ্বনির উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। লুলিয়া তখন একটি গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া এক ভীষণাকৃতি লোকের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। কিন্তু হরিচরণকে দেখিতে পাইয়াই তাহার চীৎকার থামিয়া গেল। সেই লোকটা তখন তাহাকে ছাড়িয়া হরিচরণের দিকে অগ্রসর হইল।

হরিচরণ এক লম্ফে লোকটাকে জাপটাইয়া ধরিল। দু'জনে তখন পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইল। লোকটা হরিচরণের অপেক্ষা ভারী ছিল, কিন্তু হরিচরণের দেহে বল বেশী। হরিচরণ শীঘ্রই লোকটাকে মাটিতে

ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকের উপর হাঁটু রাখিয়া বসিল। লোকটা মাটির উপর হাত ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল! মাটিতে শুইতেই তাহার হাতে এক খণ্ড পাথর লাগিল। সে সেই পাথরটা তুলিয়া হরিচরণের মাথায় ছুড়িয়া মারিল।

হরিচরণের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন গাছগুলি সূর্য্যকিরণে নাচিতেছে। সে আর লোকটাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না মৃতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

লোকটা তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণের শায়িত দেহে পদাঘাত করিয়া লুলিয়াকে ভয় দেখাইয়া বনের মধ্যে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

লুলিয়া হরিচরণের দেহের উপর অবনত হইয়া পড়িল। ভয়ে তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে; দারুণ যন্ত্রণার সহিত সে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু সে নিজের শরীরের দিকে দৃকপাত না করিয়া হরিচরণকে নিজের জানুর উপর টানিয়া লইল। হরিচরণের আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই; অল্পক্ষণ পরেই তাহার একটু জ্ঞান হইল।

তাহাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া লুলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরে তাহার ওষ্ঠদ্বয় হরিচরণের কানের কাছে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,—
"অমিয় বাবু?"

হরিচরণ সে নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।

"কি বলছো? কে— কি?"

সে আবার চক্ষু বুজিল। লুলিয়া বুঝিল হরিচরণ শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ

হইবে। সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। হরিচরণ অল্পক্ষণ পরেই আপনাকে সুস্থ বোধ করিল ও লুলিয়ার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরিচরণ তাহার মুখ হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া উদ্বিগ্নভাবে লুলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি বেশী লেগেছে?"

লুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না; আপনি যথাসময়ে এসে আমাকে রক্ষা করেছেন।"

হরিচরণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"তবে আর ভাবনা কি?" তারপর তাহার দিকে তাকাইয়া নৈরাশ্য সহকারে বলিল,—"দুর্বৃত্ত নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। কলম্বোতে এই লোকটার সঙ্গেই একটা কুকুরকে মারার জন্য আমার ঝগড়া হয়েছিল। লোকটাকে দেখি প্রায়ই আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়। বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, তাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারলাম না।" এই বলিয়া সে হতাশভাবে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছু পরে বলিল, "অসময়ে আমি আহত হয়ে পড়লাম। মনে হল যেন কি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি কি এইমাত্র আমাকে কিছু বলছিলে? আমার নাম ধরে ডেকেছিলে?"

সে উত্তর করিল,- "না।"

হরিচরণ ভ্রূকুটি করিল। বলিল, "এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়! মনে হল যেন তুমি কি একটা নাম ধরে ডাকলে। আমি বোধ হয় একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ী চল, তুমি নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছ। আমার কাঁধে ভর দিয়ে এস।"

হরিচরণ তাহার কম্পিত বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। লুলিয়া তাহা নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইল। শান্তভাবে অথচ কম্পিত স্বরে

বলিল,—"না, আমি অবসন্ন হয়ে পড়ি নি, এবার আপনাকেই আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল্‌তে হবে।"

(৪

নরেন্দ্র যূথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর মুখাকৃতি গম্ভীর করিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল, পাছে ভগ্নীদ্বয় জানালা হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে। কিন্তু বাড়ী পার হইয়া আসিবার পরই তাহার সে গাম্ভীর্য্য দূর হইয়া গেল, তাহার মাথা নত হইয়া পড়িল এবং মুখে নৈরাশ্য ও অবসাদের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

কারবারের সহিত সংলগ্ন তাহার বসতবাটী ক্ষুদ্র ও অন্ধকারময়; কারবারের কুঠি হইতে তাহার বৈঠকখানা ও আফিসঘরে যাতায়াত করা যায়। যাতায়াতের পথে ছড়িটী রাখিয়া সে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিল; চেয়ারের উপর বসিয়া মাথা পিছনে হেলাইয়া দিয়া কপোলদেশ হইতে স্বেদবিন্দু মুছিয়া ফেলিল।

নরেন্দ্র অসুস্থ। তাহার দেহের স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া গিয়াছিল। অত বড় একটা গর্হিত কাজ করিলে, একটা উইল নষ্ট করিয়া বিষয় সম্পত্তি চুরি করিতে গেলে এবং নিজের দোষে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলে কিরূপ গুরুতর মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী নরেন্দ্র প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিল। তাহার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকজনের গোলমালে ছোট বাড়ীটি স্পন্দিত হইতেছে; তাহার মনে হইল যেন সেই শব্দের সহিত মৃত বৃদ্ধের প্রেতাত্মার রুক্ষ কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

নরেন্দ্র চক্ষু বুজিল। সে রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে উদিত হইল। তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আর কি তাহা সংশোধন করা যায় না? সে সোজা হইয়া বসিয়া সম্মুখস্থ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। গভীর চিন্তায় তাহার চক্ষু ও ঠোঁটের ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে সে যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, তাহা কি ফিরিয়া পাইবার আর কোন উপায় নাই? তবে কি তাহাকে এই প্রকাণ্ড বাড়ী, বিষয় সম্পত্তির আশা সব ছাড়িতে হইবে? কেবল মাত্র এই সামান্য কারবারের মালিক হইয়া কি তাহাকে আজীবন কষ্টভোগ করিতে হইবে?

এই অদ্ভুত উইল আইনে টিকিবে কি? ইহার বিষয়ে কি কেহই আপত্তি তুলিবে না? তাহার একমাত্র উপায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে যূথিকাকে বিবাহ করিতে অমিয়কুমারের অসম্মতি এবং পরে যূথিকার যথা শীঘ্র-সম্ভব মৃত্যু। এই দুই ঘটনা না ঘটাইতে পারিলে, তাহার নিজের লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এ আশা মনের মধ্যে পোষণ করাও বৃথা। কারণ অমিয় কি এত নির্ব্বোধ হইবে যে, যূথিকাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া সে এই সম্পত্তি হারাইবে! যদিই বা সে অস্বীকার করে, তাহা হইলেও যূথিকা ত রহিয়া যাইবে; সে যুবতী, বেশ বলিষ্ঠা ও সুস্থ; তাহার শীঘ্রই মরিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই!

অমিয়ই বা বিবাহে অস্বীকার করিবে কেন? যূথিকা সুন্দরী, যুবতী, ও নানা সদ্‌গুণে বিভূষিতা। নরেন্দ্র নিজেই যদি আজ এই বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইত, তাহা হইলে সেই যূথিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিত।

সে চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার জীর্ণ হস্তদ্বয় অসুখের জন্য আরও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে হস্ত দুইটি পশ্চাৎ দিকে রাখিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন, এক তেজীয়ান্ ব্যাঘ্র, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ জালে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে ধাক্কা মারিল। তখন সে মন হইতে এই সব চিন্তা দূর করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিল হারাধন, যাহাকে সে সম্প্রতি কারবারের গোমস্তারূপে নিযুক্ত করিয়াছে, দ্বারদেশে উপনীত।

হারাধন ঘরে ঢুকিয়াই বলিল,—"আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, ক্ষমা করবেন; আপনি বলেছিলেন কাগজপত্র লেখা হয়ে গেলেই নিয়ে আসতে, তাই এনেছি।"

"তা, বেশ করেছ।"

এই কথা বলিয়া নরেন্দ্র আফিস-ঘরে গিয়া তাহার চেয়ারে বসিল। হারাধন সম্মুখস্থ টেবিলের উপর কাগজপত্র রাখিল। টেবিলটি হিসাবের খাতা ও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে পরিপূর্ণ। নরেন্দ্র কাগজপত্র গুলির উপর চোখ বুলাইয়া গেল।

"এ সব ঠিক হয়েছে।"

হারাধন তাহার হাত হইতে সেগুলি লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নরেন্দ্র তাহাকে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"দাঁড়িয়ে কেন? আর কিছু দরকার আছে?"

হারাধন উত্তর করিল ;—"আজ্ঞে, আমার মনে হয় সরকার রামদাসের ব্যবহার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানান উচিত।"

নরেন্দ্র একটুকরা কাগজ লইয়া তাহাতে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লেখা বন্ধ করিয়া উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তার কি হয়েছে ?"

"আজ্ঞে সে আবার অতিরিক্ত মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় এক সপ্তাহ কাজে আসে নি। আজ এসেছে, কিন্তু মাতাল অবস্থায়। তাকে ভরসা করে কোন কাজই করতে দিতে পারা যায় না। আমিও তাকে জানিয়েছি আজ আপনাকে এ কথা বলব। আমার মনে হয় এ বিষয় আপনাকে জানান আমার কর্ত্তব্য। কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ রামদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আমি বিশেষ দুঃখিত। সে আমাদের একজন পুরাতন সুদক্ষ সরকার ছিল। সম্প্রতি লুলিয়া নামে একজন হিন্দুস্থানী যুবতী এখান হতে কাজ ছেড়ে চলে যাবার পরই তার এই অধঃপতন আরম্ভ হয়েছে। আপনি তার প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেছেন, তার অনেক দোষ ক্ষমা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই তার শিক্ষা হয় নি। মদ খেয়ে রাস্তায় হাল্লা ও মারামারি করার জন্য পুলিসের হাতে ধরা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গেছে। তাকে আর কাজে রাখা উচিত নয়।"

নরেন্দ্র আবার পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। পরে ধীরভাবে বলিল, - "আচ্ছা, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

হারাধন চলিয়া গেলে নরেন্দ্র লেখা বন্ধ করিল এবং মাথা না তুলিয়াই চিন্তিতভাবে কাগজখানি দেখিতে লাগিল। যেন কোন একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সে চেষ্টা করিতেছে। তারপর মাথা

নাড়িয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় একজন লোক দ্রুত পদবিক্ষেপে আসিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল। নরেন্দ্র স্থিরচিত্তে "ভেতরে এস" এই কথা বলিতেই, লোকটি ঘরের ভিতর ঢুকিল।

আগন্তুক পশ্চিমদেশীয় হিন্দুস্থানী, সুশ্রী ও বলবান্। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মুখে ধ্বংসের রেখা স্পষ্ট অঙ্কিত হইলেও সে দেখিতে সুন্দর। তাহার একটা চোখ ফুলিয়া গিয়াছে, ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে, গণ্ডস্থল ও কপোলে গুরুতর আঘাতের দাগ রহিয়াছে, তাহার সুন্দর কেশরাশি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন ও ধূলিধূসরিত। তাহার আকৃতি দেখিলে মনে হয় যেন এইমাত্র সে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া রাস্তায় মারামারি করিয়া আসিয়াছে।

লোকটি দরজার কাছে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্র কিছুক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিল না। নির্ব্বাক্ তিরস্কারের প্রভাব কিরূপ তাহা নরেন্দ্র বেশ জানিত, পরে পত্র হইতে মুখ তুলিয়া স্থিরচিত্তে বলিল,—"রামদাস, তুমি আবার অতিরিক্ত মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছ?"

রামদাস একবার গম্ভীরভাবে মনিবের মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

নরেন্দ্র পুনর্ব্বার বলিল,—"হারাধন বল্লে, তুমি প্রায় এক সপ্তাহ কাজে আস নি। বোধ হয় ক'দিন খুব মদ খাচ্ছিলে?"

রামদাস সাহসে ভর করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, সে কথা সত্যি। আমি মদই খাচ্ছিলাম।"

"মারামারিও করেছিলে বোধ হয়? এ সকলের জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"যখন নেশা ছুটে যায়, জ্ঞান ফিরে আসে, তখন আমার লজ্জা হয়।" রামদাস কৃতকর্ম্মের জন্য যথার্থই দুঃখিত হইয়া অনুতপ্ত ভাবে এ কথাগুলি বলিল।

নরেন্দ্র চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বলিল,—"এক সময় তুমি আমাদের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলে।"

রামদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আজ্ঞে এক সময় ছিলাম বটে! কিন্তু সে অনেক দিন পূর্ব্বে। তখন কার্য্যে একটা উৎসাহ ছিল, প্রাণধারণ করবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এ রকম অবস্থায় সকলেই মন দিয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু যখন আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি গেল, তখন মনে হ'ল"—তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! দরজাটা জোর করিয়া ধরিয়া সে বলিল—"যেন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, জীবনের সব সুখ শেষ হয়ে গেছে; তখন আর নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখবার চেষ্টা করতে ইচ্ছা করে না। অতীতের স্মৃতি ভুলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এ কষ্ট যন্ত্রণা, মদ না খেলে ভুলতে পারা যায় না! সেইজন্যই আমি মদ খাই, মারামারি করি। আপনিই বিচার করে দেখুন, আমার মতন অবস্থায় পড়লে আপনিই বা কি করতেন?" এই বলিয়া সে করুণভাবে নিজের হাত প্রসারিত করিয়া দিল,—"আপনি যদি কোন স্ত্রীলোককে আপনার প্রাণের অপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন, যে আপনার স্ত্রী হবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর সে স্ত্রীলোককে যদি কেহ আপনার নিকট থেকে কেড়ে নিত, তাহলে আমিও বেশ বলতে পারি আপনিও নিশ্চয়ই মদ্যপানে আমার মত অভ্যস্ত হ'তেন। আমার এ বাচালতা মাপ করবেন। আপনি মনিব, আমি চাকর, আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলা আমার ঠিক হয় নি,

কিন্তু মনের আবেগে বলে ফেলেছি। আপনার কাছে দুঃখ জানাব না তো আর কার কাছে জানাতে যাব ?"

নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"না তাতে আমি কিছু মনে করবো না, কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকের জন্য এত কষ্ট ভোগ করা উচিত নয়। পৃথিবীতে সে ছাড়া আরও অনেক বিবাহযোগ্য স্ত্রীলোক আছে। এই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া তোমার উচিত। তার নাম কি ?"

"লুলি,---লুলিয়া", রামদাস অতিকষ্টে উত্তর করিল। যেন সেই নাম উচ্চারণ করিতেও তাহার অন্তঃকরণে আঘাত লাগিতেছে।

"হাঁ, তার নাম মনে পড়েছে বটে। আচ্ছা, রামদাস, তাকে ভুলে যাও ; আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছি।"

রামদাস উচ্চৈঃস্বরে বলিল,---"আপনি কি মনে করেন, আমি তাকে ভুলবার চেষ্টা করি নি। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ভুলতে পারি নি।" রুদ্ধ বেদনায় গুমরাইতে গুমরাইতে আবার সে কহিল,— "যাবার দিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা একসঙ্গে ছিলাম। মারা গেলে, সে কষ্ট আমি সহ্য করতে পারতাম, তার উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ থাকত না, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আশায় অপেক্ষা করতাম। তখনও সে আমারই থাকত। কিন্তু এ রকম করে আমাকে প্রতারণা করা, আমাদের বিয়ের সপ্তাহ পূর্ব্বে চলে যাওয়া! এই ব্যাপারই আমার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। এ আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। অবশ্য যে লোকটা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, তার উপরই আমার বেশী

রাগ, সেই লোকটা মাঝখানে না আসা অবধি সে খুব সৎ ও সরল ছিল।"

নরেন্দ্র শান্তদৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইল। এই লোকের দুঃখের কথা শুনা এবং সম্ভবপর হইলে তাহাকে সাহায্য করা তাহার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সে কতকটা অনিচ্ছার সহিতও ধৈর্য্যসহকারে তাহার কথা শুনিতেছিল।

নরেন্দ্র নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, বরং রামদাসের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— "তুমি সেই লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারো নি? সে কে, তাও জানতে পার নি?"

"আজ্ঞে না, আমি তার কোনও সংবাদ পাই নি। কোথায় যে তার অন্বেষণ করব, তাও বুঝতে পারি নি। আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন, আমার মনে আদৌ সন্দেহ ছিল না। সে শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এমন চতুর ভাবে প্রতারণা করে এসেছে। তার প্রথম স্বামী মারা যাবার পর এখানেই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সবাই জানত শীঘ্রই আমাদের বিয়ে হবে।" এই বলিয়া সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল বিস্তার করিয়া দিল। "না, এমন কোন চিহ্ন নেই, যা ধরে আমি অন্বেষণ করি। রাত্রে চোরের মত সে পালিয়ে গেছে!"

তাহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। সে দাঁত কিড়মিড় করিতে করিতে বলিল,—"কিন্তু আমি এখনও তার অন্বেষণ করছি। কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পাব। খুঁজে পেলে, একবার তাকে খুঁজে পেলে—" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; অতি কষ্টে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া

সে আবার কহিল—"তার সঙ্গে আমার বোঝা পড়া ; তাকে এমন শিক্ষা দেব যে সারাজীবনে সে তা ভুলতে পারবে না।"

নরেন্দ্র সম্মুখে একটু হেলান দিয়া বসিল। হাতে কলম লইয়া বলিল,—"থাক্ রামদাস ও সব পাগলামি, বাজে কথা ছেড়ে দাও। পূর্ব্বে তোমাকে আমি যেমন জানতাম, তাতে আমার বিশ্বাস যে, তোমার ন্যায় একজন বুদ্ধিমান লোক, তোমার স্ত্রী হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই যুবতীর প্রতারণায় ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে না! অবশ্য তোমার ভালমন্দ তুমি বুঝবে; তবে তোমার কষ্টের কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত এবং সম্ভব হ'লে তোমার কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তুমি বেশ বুঝতে পারছ যে, এ যা ব্যাপার, তাতে তোমাকে কারও সাহায্য করা অসম্ভব। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, বলবার জন্যে, যে তোমার ব্যবহার অসহ্য হয়ে পড়েছে। এতে যদি আমরা চুপ করে থাকি, ভবিষ্যতে তার বড় কুফল ফলবে। তোমাকে যদি আমি মদ খেয়ে কাজ করতে বা অভদ্র ব্যবহার করতে অনুমতি দিই, তাহ'লে কারবারের অপর কোন কর্ম্মচারী এই পথ অবলম্বন করলে তাও সহ্য করতে হবে। সত্য কথা বলতে কি, রামদাস, তোমার ন্যায় একজন দক্ষ কর্ম্মচারী গেলে, আমরা দুঃখিত হব বটে, কিন্তু কি করি, তোমাকে ছাড়াতে আমরা বাধ্য হয়েছি।"

রামদাসের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলিল,—"মশাই, আমি পূর্ব্বেই জানতে পেরেছিলাম, আপনি আমাকে এ কথা বলবেন। আমি তা শুনবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিলাম। আমার এ শাস্তি উপযুক্ত বটে ; কিন্তু আমাকে কর্ম্মচ্যুত করা মানে আমার সর্ব্বনাশ

করা। এ কাজ গেলে, আমার আর কোথাও কাজ জুটবে না। সংসারে একলা হ'লে, আমি আদৌ গ্রাহ্য করতাম না। পথের কুকুরের মত নর্দ্দমায় শুয়ে এই তুচ্ছ জীবন কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি জানেন, আমার মা এখনও জীবিত আছেন। কাজ গেলে সংসার কেমন করে চলবে তা জানি না, তাঁর কষ্টের সীমা থাকবে না। মশাই, এবারও আমার দোষ ক্ষমা করুন; আমাকে আর একবার দেখুন।" সে করুণস্বরে নরেন্দ্রের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

নরেন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি পত্র লিখিতেছিল। এই সব শুনিয়া তাহার প্রতি একবার তাকাইল। কি উত্তর দিবে, প্রথম স্থির করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল,—"রামদাস তোমার মায়ের খাতিরে, এবারও তোমার দোষ ক্ষমা করলাম! তুমি যখন বালক তখন থেকে এই কারবারে ঢুকেছ। এই ঘটনা ঘটবার আগে পর্য্যন্ত তুমি বেশ মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে এসেছ। সৎপথে আসবার আর একটা অবসর তোমাকে দিলাম। কাজে যাবার পূর্ব্বে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাও যে, তুমি নিজেকে সংশোধন করে পূর্ব্বের ন্যায় ভদ্র ব্যবহার করবে।"

রামাদাস হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কৃতজ্ঞতাসহকারে নরেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আপনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। এতটার আমি উপযুক্ত নই। আমি নূতনভাবে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করব—এ সব ভুলে যেতে চেষ্টা করব—"

নরেন্দ্র শান্তভাবে বলিল,—"হাঁ, ভুলে যেতে চেষ্টা কর। ইহার

সব চেয়ে ভাল প্রতিজ্ঞা। এই উপদেশই আমি তোমাকে দিচ্ছি। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার।"

নরেন্দ্র মুখ না তুলিয়াই লিখিতে লাগিল। অনুতপ্ত রামদাস দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্র তখন কলম ছাড়িয়া সেই দিকে একবার তাকাইল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ মনে হইল পত্র লিখিতে সে কোন গোলযোগে পড়িয়াছে। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইল, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের বৈঠকখানা ঘরে গেল। "না, এরূপ আলস্যে সময় কাটান উচিত নয়, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।" এই বলিয়া সে আফিস-ঘরে ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার নিজের কার্য্যসাধনে রত হইল।

(৫)

"এই দেখ টক্ করমচা ফল!" বেলা চেঁচাইতে চেঁচাইতে বৈঠকখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। যখনই সে আসিত, তাহার পিছু পিছু যেন হাসির ও আনন্দের একটা ঝড় বহিয়া যাইত। যূথিকা সুন্দর টেবিলের উপর কাগজ ফেলিয়া লিখিতেছিল। "আমি এগুলি নিজের হাতে কুড়িয়ে এনেচি" এই বলিয়া সে তাহার গোলাপী হাতের চেটো বাড়াইয়া দিল। তাহার উপর কতকগুলি ফল; ফলগুলির রংও হাতের চেটোর অপেক্ষা বেশী গোলাপী নহে,—"মালী ফলগুলি কুড়ুতে বারণ করেছিল, তা সত্ত্বেও আমি এনেচি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এই সব নিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রায়ই খুটি-নাটি চলবে। তার এক প্রধান দোষ, সে মনে করে, এই বাগান, ফলফুলের গাছ সবই তার। এইখানেই তার সঙ্গে আমার

ঝগড়া। এ সব যে তোমার, তা আমি বেশ মিষ্টি কথায় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। সে বলে যে, এই ফলগুলি এখন জড় করে রাখছে, পরে অনেকগুলি একত্র হ'লে একদিন খাবার সময় দেবে, আমি তাকে ভদ্রভাবে বল্লাম, আমরা এগুলি পৃথক্ ভাবে খেতেই ভালবাসি। ফলে, সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষণ্ণ মুখে চলে গেল। আমিও যুদ্ধ জয় করে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্দ্ধেক তোমাকে ভাগ দেবার জন্য এসেছি। দিদি, তুমি গোটাকতক নাও, বাকিগুলো আমার জন্য রেখ। তুমি নেবে না? তাহ'লে আমি সবগুলোই খেয়ে ফেলি।"

যূথিকা হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। সে চেয়ারে ঠেস্ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হ'য়েছে? রাজকন্যার মুখে চিন্তার রেখা কেন?"

যূথিকা তাহার কপোল হইতে কেশরাশি সরাইয়া, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"আমি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি। নানা লোক আমাকে পত্র লিখছে। সে সব পত্রের কি উত্তর দেব, তা জানি না।"

বেলা তাহার পোষাকে একটি ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল,—"উত্তর দিও না। একজন বড় লোক বলে গেছেন, পত্রের উত্তর না দিলে, তারা নিজেদের উত্তর নিজেরাই দেবে।"

"এ কথা যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু কাজের চিঠির, বিষয়-সংক্রান্ত পত্রের উত্তর নিশ্চয়ই দিতে হবে। আজ সকালে গোপাল বাবু একতাড়া চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি কি বলি? আমি বলতে পারি না যে,

আমি এখানকার প্রকৃত অধিকারিণী নই—অমিয় বাবু না আসা পর্য্যন্ত আমি ইহার রক্ষক বা অভিভাবক মাত্র।”

বেলা একটা বিড়ালছানা হাতে তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে হস্তস্থিত কবমচা ফলের লোভ দেখাইতে দেখাইতে বলিল,—“সেই দুর্ব্বোধ যুবকের কাছ থেকে কোন সংবাদ আসে নি বোধ হয়?”

যূথিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—“না, কোন সংবাদই আসে নি। গোপাল বাবুও তাঁকে পত্র লিখেছিলেন, তারও কোন উত্তর নেই। কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।”

বেলা পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা সহকারেই উত্তর করিল,—“হয় ত তিনি মারা গেছেন।”

“কেন, মারাই বা যাবেন কেন?”

“তা বলতে পারি না। তবে তুমিই বা কেমন করে জানলে যে, তিনি বেঁচে আছেন? মানুষের স্বভাবই মরা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তা নিয়ে তোমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিষয় সম্পত্তি পুনর্ব্বার দখল করেছি।—গাড়ী, ঘোড়া প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, আসবাব, বিলাসের সামগ্রী, প্রচুর অর্থ—কিসের অভাব?”

“বেলা! চুপ কর। বাজে কথা কি বলছ?”

“তুমি রাগ করে থাক ত, চুপ করি। কিন্তু আমার উপদেশ শোনো; এস, আমরা বেশ আমোদ আহ্লাদ করে দিন কাটাই। তুমি আনন্দ উপভোগ করতে পারছ না কেন? আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানে বড়। আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। আমি দিবসের প্রতি

ঘণ্টাই আমোদ উপভোগ করছি ; কিন্তু তুমি খালি মুখ-ভার করে বসে আছ, প্রতি কাজে বিরক্ত হচ্ছো, যেন জীবনটা তোমার কাছে এক মস্ত বড় ভার ! তুমি দেখছি, আবার আমাদের সেই পুরাতন বসতবাটীতেই ফিরে যেতে চাও।"

যূথিকা টেবিলের উপরিস্থিত পত্ররাশির প্রতি হতাশভাবে তাকাইয়া বলিল,—"যথার্থই আমি তাই ইচ্ছা করি। সেই জীবন যাপনই বড় সুখের ছিল ; তখন আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলে ফিরে বেড়াতাম, এমন ছায়াকৃতির মত বাতাসের ভরে এদিক ওদিক উড়ে বেড়াতে হত না।"

বেলা বিড়ালের গায়ে মুখ রাখিয়া বলিল,—"এই ছায়াকৃতির ন্যায় ভেসে বেড়ানই ভাল। তুমি দিন রাত এই রকম মুখ-ভার করে বসে থাক, তা হ'লে দুদিনে নরেন্দ্র বাবুর মতন রুগ্ন ও জীর্ণ হয়ে পড়বে। হাঁ, ভাল কথা, তিনি কি আজ এখানে এসেছিলেন ?"

"হাঁ, বিষয়সংক্রান্ত কোন কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন। আমাকে বিষয় কর্ম্মে সাহায্য করতে, তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমাদের ন্যায় দুজন নিরুপায় পিতৃ-মাতৃ-হীন বালিকার জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করা, নিশ্চয়ই তাঁর দয়া ও মহত্ত্বের পরিচয়।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি ; তিনি এই সপ্তাহের প্রতিদিনই এখানে আসছেন, সত্য নয় কি ?"

যূথিকা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "হাঁ—না ; আমার ঠিক মনে নেই।"

"এটা মনে না থাকা অকৃতজ্ঞের কাজ।" তার পর বিড়ালছানার

দিকে তাকাইয়া বলিল,—"পুসু, নরেন্দ্র বাবুর মতন তোর থাবাগুলো ভেতরে লুকিয়ে রেখে দে।"

যূথিকা তিরস্কার-পূর্ণ নয়নে তাহার প্রতি তাকাইল।

"বেলা, এ সব কথা ঠাট্টা করেও তোমার বলা উচিত নয়!"

বেলা যূথিকার চিন্তাপূর্ণ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"তুমি কি রকম করে জানলে যে আমি ঠাট্টা করে বলছি?"

"বেলা! এ ব্যবহার ভদ্রতাসঙ্গত নয়। তাঁর সহৃদয়তার জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত।"

"সহৃদয়তা কথাটা খুব লম্বাচওড়া বটে।"

"দেখ, অমিয়কুমার পিতাকে ত্যাগ করবার পর—"

"ওঃ! আমি মনে করেছিলাম পিতাপুত্রে ঝগড়া হয়েছিল এবং জ্যোতির্ম্ময় বাবু সেই জন্যে ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক্ তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি বলে যান, ন্যায়পরায়ণ বিচারক মহাশয়, বলুন।"

"যা হোক্, নরেন্দ্রবাবু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি সব কাজে খুড়োকে সাহায্য করতেন। বিষয় কর্ম্মে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বল্লেই হয়। এক কথায় তিনি নিজের অশেষগুণে তাঁর পুত্রের স্থানই অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোন কথাই বলতে পারে নি। সকলেই মনে করেছিল, জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাঁকেই বিষয় সম্পত্তি ও নগদ টাকা কড়ি সব দিয়ে যাবেন। পাড়ার দুজন বৃদ্ধা কাল এখানে এসেছিলেন, বল্লেন তাঁরাও মনে করেছিলেন নরেন্দ্রই বৃদ্ধের বিষয় সম্পত্তি সব পাবে। কিন্তু কার্য্যে সেরূপ না হওয়ায় তাঁরা বড়ই বিস্মিত হয়েছেন। তাঁকে বিষয়

সম্পত্তি ও টাকা কড়ি কিছু না দিয়ে জ্যোতির্ম্ময় বাবু কেবল কারবারটাই দিয়ে গেছেন।"

"তা'হলে বলতে হবে অতি ভাল জিনিষই দান করে গেছেন। আমি শুনেছি, জ্যোতির্ম্ময় বাবু ঐ কারবার থেকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করেছেন।"

যুথিকা অধীরভাবে নড়িয়া উঠিল। বলিল,—"তুমি তা'হলে পাড়া-পড়ুসির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে বেড়াচ্ছ?"

"বুদ্ধিমান লোকে সব শুনেই বেড়ায়, কথা কয় না। আমাদের বন্ধুরা দিন রাতই আমাদের বিষয় আলোচনা করছে। আমি ত আর কালা নই। আমি সব শুনি, তাদের কথা থেকে অনেক নতুন জিনিষ শিখি এবং মনে মনে সেগুলো পরিপাক করি। তুমি যদি আমার মতামত চাও তা'হলে—"

যুথিকা হাসিয়া বলিল,—"আমার দরকার না হ'লেও, বাধ্য হয়ে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে!"

বেলাও প্রফুল্লবদনে উত্তর করিল,—"আমার মনে হয়, আমার পরামর্শ গ্রহণ করা তোমার দরকার হয়ে পড়েছে। আমি আমার মনের ভাব স্পষ্টই প্রকাশ করব, কারো ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক। আমার মতে নরেন্দ্র বাবুর প্রতি খুব ভাল ব্যবহারই করা হয়েছে। আমার এই অযাচিত অতৃপ্তিকর মত প্রকাশ করেই আমি বেড়াতে যাচ্ছি, আর তোমাকে বিরক্ত করবো না।"

"বেলা, তুমি বুঝতে পারছ না যে, আমাদের এই সুখসমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী শীঘ্রই এর অন্ত হবে।"

বেলা হাস্যমুখে বলিল—"হাঁ, তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তুমি বুঝে যেমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ, মুখে হাসি নেই, খেলায় আমোদ নেই, তা আমি পারি নি। যতক্ষণ সূর্য্য কিরণ দেয়, প্রজাপতির ন্যায় আমিও আনন্দ উপভোগ করতে ইচ্ছা করি। তুমিও আমার সঙ্গে এস না?"

যূথিকা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল। পরে উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া বলিল,—"আমার সময় নেই। আমাকে এখন কাজ করতে হবে, এতগুলি পত্রের উত্তর দিতে হবে।"

"কর্ত্তব্যজ্ঞান ও বিষয়ের দায়িত্ব তোমাকে আনন্দ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছে। তোমার অল্প বয়স এবং অল্পবয়স্কদের একটা প্রধান দোষ তাদেব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানটা বড় বেশী। কিন্তু এ দোষ তোমার শীঘ্রই কেটে যাবে। তুমি যখন আমর মতন বুড়ো হবে—"

বেলা লিখিবার টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যূথিকা তাহার সেই প্রফুল্ল সরল মুখখানি নিকটে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। চুম্বন করিবার সময় বেলার এক গুচ্ছ চুল তাহার চোখে পড়িয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

"বেলা, তুমি বড় অপরিপাটী!"

বেলা লজ্জিত হইয়া বলিল,—"সে কথা সত্য বটে। আমার জীবনেব প্রধান উদ্দেশ্য আমার বড় বোনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করা; তার ঠিক উল্টো গাওয়া। তুমি সুন্দরী, আমি দেখতে সাদাসিধে। তুমি সভ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমি অভদ্র ও অশিষ্ট; তুমি সকল গুণের আধার—স্বার্থহীন, কর্ত্তব্যপরায়ণ, উদার, স্ত্রীজনোচিত সকল গুণে ভূষিতা, আমি

হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা, মস্ত বড় স্বার্থপর প্রাণী। তোমার সম্মুখে উচ্চ আদর্শ, আমার কোন আদর্শ নেই। সত্যের পূজা করতে গিয়ে তুমি সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করতে পার, এই অগাধ বিষয় সম্পত্তিও ছাড়তে পার”—এই বলিয়া সে একবার মহামূল্য সুন্দর আসবাব পরিপূর্ণ ঘরের দিকে তাকাইল,—“প্রয়োজন হ’লে তৃণশয্যায় শয়ন করতে পার; আমি বিলাস-সাগরে ডুবে রয়েছি, অতীব তৃপ্তির সঙ্গে রাজভোগ আহার করছি, এই গাড়ী ঘোড়া আমার খুব ভাল লাগছে। বাস্তবিকই আমি পার্থিব সুখ-সম্পদে বিভোর হয়ে রয়েছি, সংসারের সুখের মোহে মুগ্ধ হয়ে গেছি। দিদি, তুমি আমার মস্তকের উপরিস্থিত আকাশে ভেসে বেড়াও; স্বর্গের অপ্সরার ন্যায় নন্দনকাননই তোমার উপযুক্ত স্থান, এই পাপতাপপূর্ণ সংসার তোমার ন্যায় রমণীর উপযুক্ত বাস-স্থল নয়!”

যূথিকা হাসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল। বেলা তাহার ক্ষুদ্র বাহু দুইটি দ্বারা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

“যাও, বেড়াও গে, কথায় তোমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না!”

“এখানে আসা অবধি, এই আজ প্রথম তোমাকে বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে শুনলাম। দেখ, যেন এ বুদ্ধিটুকু আর নষ্ট না হয়। নাও, বেলার প্রস্থান ও যবনিকা পতন।”

বেলা বিড়ালছানা এবং কথার ঝড় লইয়া চলিয়া গেল। যূথিকা নিজের কাজে নিযুক্ত হইল। তাহার মনে হইল যেন পৃথিবীর সমস্ত ভার তাহার মস্তকে চাপিয়াছে। তাহার আদৌ ধারণা ছিল না যে, এ বিষয় সম্পত্তি এত বিস্তৃত এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন অস্থায়ী মালিককেও এত বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। অস্থায়ী মালিক! এই চিন্তাই ত কষ্টদায়ক!

তাহার হিতকারী বন্ধুরা তাহার এই সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকে ইহার স্থায়ী মালিক হইতে জিদ করিয়াছেন। তাঁহারা সবাই স্থির করিয়াছিলেন যে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পুত্র অমিয়কুমার ও পুরাতন রায় বংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি যূথিকা পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই বিষয়সম্পত্তি ভোগ করিবে এবং দীন দুঃখী প্রজাদের যথাসাধ্য কষ্ট ও অভাব মোচন করিবে।

এই ধারণা প্রজাদের মনে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, সে স্থির মীমাংসার বিরুদ্ধে কিছু বলা যূথিকার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যদিও সে দুই একজন প্রজাকে বলিয়াছিল যে এ সম্পত্তির সে অস্থায়ী মালিক মাত্র, তাহারা হাসিয়া এই গুরুতর কথাটা উড়াইয়া দিয়াছে এবং কিছুতেই ইহা স্বীকার করিতে রাজি হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময় বাবু অবশ্য লোক খুব ভাল ছিলেন। তিনি একজন সদাশয় জমিদার ও সহৃদয় মনিব ছিলেন, সময়ে সময়ে তিনি বিপন্ন লোকজনকে অর্থদানেও সাহায্য করিতেন, তবুও তিনি প্রজাগণের মন জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ইহারা অনধিকার-প্রবেশকারীর ন্যায় জ্ঞান করিত—যেন কেবল অর্থের বলে কোথাকার কে একজন এই প্রাচীন বংশকে বাসচ্যুত করিয়াছে! তাহাদের মন সেই পুরাতন প্রভুবংশের প্রতিই বিশ্বস্তভাবে অনুগত ছিল।

তাহাদের কথাই যূথিকা তখন ভাবিতেছিল এবং পত্র লেখা অসম্ভব দেখিয়া সে উঠিয়া খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে উদ্যান ও দূরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর সুন্দর ও বিস্তৃত দৃশ্য তাহার নয়ন-পথে পতিত হইল। সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে, বাল্যকালে যে ভাবে সে এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, দিন দিন তদপেক্ষা আরও দৃঢ়ভাবে এবার সে

ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছে। ইহা তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান। সে এই স্থানের সকল প্রজাকেই ভালবাসে। সেও মনে মনে বেশ বুঝিতে পারে যে, প্রজারাও তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত; তাহারা তাহার নিকট অকপট চিত্তে তাহাদের দৈনিক জীবনের হাসিকান্না ও সুখদুঃখের কথা প্রকাশ করিত, এমন কি তাহার নিকট সহানুভূতি লাভের আশা ও তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিত।

যূথিকা এ বাড়ীতে আসিতে না আসিতে প্রত্যহই দু'একজন নিঃস্ব প্রজা তাহার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী হইয়া তাহার নিকট আসিয়াছে। সাহায্য-প্রার্থিগণ সফল-মনোরথ হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। কেবল যে অর্থ ও বস্ত্র পাইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া যূথিকা যে গভীর সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছে, তাহার জন্যই তাহার নিকট তাহারা বেশী কৃতজ্ঞ।

তাহার অধীন লোকদের দুঃখ ভাবিয়া যূথিকা যে দুঃখিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? কয়েক মাস পরেই তাহাকে এই প্রিয় স্থান ও লোকজন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অমিয়কুমার ইহাদের উপর শাসন-দণ্ড চালাইবেন। তিনি কি রকমের লোক? যূথিকা মনে মনে আপনাকে এই প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত। অবশ্য রায়বংশেও অনেক অসংযতচিত্ত জমিদার ছিল, প্রজাগণের সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন, যাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তিই নষ্ট করিয়া গিয়াছে, অমিয়কুমারও কি তাহাদের মত একজন হইবেন? তিনিও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ভ্রমণশীল জীবনে অপরাপর সমাজচ্যুত অসচ্চরিত্র ব্যক্তির সহিত অধিকাংশ

সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি যে এই লোকদের সুশাসনে রাখিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

তিনি আছেনই বা কোথায়? তিনি বাড়ী আসিয়া কেন তাহার উদ্বেগের নিবারকরণ করিতেছেন না? গোপাল বাবুর পত্রের উত্তর স্বরূপ এতদিনে তাঁহার স্বয়ং এখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল!

যূথিকার মনে যখন এইসব গোলমেলে চিন্তা উদিত হইতেছিল, সেই সময় বেলা বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার চুল বাতাসে উড়িতেছে, কোমল মুখ রক্তাভ। সে যূথিকাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল; তাহার বালসুলভ কোমলস্বরে বলিল, "তুমি আসবে না? তাহ'লে আমি একলাই যাই। সত্যি তোমাকে একখানি ছবির মতন সুন্দর দেখাচ্ছে!"

বালিকা বাড়ীর বাহির হইল। তাহার কথা ভাবিয়া যূথিকা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, বেলাকে যখন এই বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন না জানি তাহার কত কষ্টই হইবে! হয় ত বা এখানে আজীবন থাকিবার জন্য সে জিদ করিয়া বসিবে।

হায়, অমিয়কুমার কেন আসিলেন না!

* * * * *

অমিয়কুমারের না আসিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কারণ তাহার পিতার পত্র তাহার হস্তগত হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রের নিকটই চিঠির বাক্সের চাবি থাকিত এবং চিঠিগুলি ডাকে দিবার পূর্ব্বে সে খামের ভিতর হইতে পত্রগুলি যত্নে বাহির করিয়া মনোযোগের সহিত পড়িত। মনুষ্যচরিত্র

সম্বন্ধে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই জন্যই পাছে জ্যোতির্ম্ময় বাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে একমাত্র সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লেখেন, এ বিষয়ে সে খুব সতর্ক ছিল। তাহার এই ধারণা কাজেও ফলিয়া গিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় বাবু পুত্রকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পত্র লেখেন। নরেন্দ্র চিঠির বাক্স হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া, পড়িয়া তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে।

গোপাল বাবুর পত্র অমিয়কুমার কলম্বো পরিত্যাগ করিবার পরই সেখানে পৌঁছায়। অতএব সে তাহার পিতার মৃত্যুর কথা বা উইলের বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। তখন সে হরিচরণ নাম গ্রহণ করিয়া দেবপালের অধীনে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিল। তাহার গুণে ও কার্য্য-কুশলতায় মনিব ও অনুগত লোকেরা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল; সেও উৎসাহের সহিত নিজের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইত।

হরিচরণের একজন বিশেষ বিশ্বস্ত ভক্ত ছিল,—লুলিয়া। কিন্তু সে তাহা জানিত না। লুলিয়া কদাচিৎ তাহার সহিত কথা কহিত বা তাহার কার্য্যাবলি বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিত। কিন্তু হরিচরণ যখন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, লুলিয়ার দিকে লক্ষ্যও করিবার অবসর থাকিত না, লুলিয়া তখন একদৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিত। তাহার অগোচরে তাহার সুখবিধানের জন্য লুলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিত। হরিচরণ কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিত, তাহার অপরিষ্কার টেবিলের উপর এক রাশ ফুল রহিয়াছে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত। প্রতিদিন আহারের সময় নানাপ্রকার রুচিকর খাদ্যদ্রব্য আসিয়া হাজির হইত।

হরিচরণ এই সব আদর যত্নের জন্য গৃহস্বামীর নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। কিন্তু লুলিয়াই যে টেবিলে ফুল রাখিয়া যাইত, পোষাক পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিত, তাহার রুচিকর খাদ্য হয় সে স্বহস্তে পাক করিত, কিংবা তাহা পাক করিবার জন্য কর্ত্রীঠাকুরাণীকে বলিয়া দিত, হরিচরণ তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পাইত না। হরিচরণ খাইবার সময় গৃহকর্ত্রীর দয়ার বা গুণের প্রশংসা করিলে, লুলিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইত এবং একদৃষ্টে তাহাকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লক্ষ্য করিত।

স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্যের গুণে লুলিয়ার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল। তাহার শরীর এখন একটু হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। তবুও মধ্যে মধ্যে অতীত দুঃখকষ্টের একটা কৃষ্ণ ছায়া কোথা হইতে আসিয়া তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিত। সেই অতীত দিনের কথা সে কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সে কথাই খুব অল্প কহিত, নিঃশব্দে নিজের কাজ করিয়া যাইত। সেইজন্য কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রায়ই তাঁহার স্বামীর কাছে বলিতেন,—"হরিচরণ যে নিজেই এক রত্ন বিশেষ তা নয়, সঙ্গেও এক রত্ন নিয়ে এসেছে।"

এই চা-বাগান হইতে বিশ মাইল দূরে দেবপালের আর একটি বাগান ছিল। জমিটি চাষের বেশ উপযুক্ত। দেবপাল এই চা-বাগান লইয়াই এত ব্যস্ত যে অন্য বাগান দেখিবার তাহার আদৌ সময় ছিল না। সেখানকার ঘর বাড়ী সব প্রায়ই পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকের বেড়াগুলি সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হরিচরণ এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়া জমির অবস্থা সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে; এ স্থানে

আবাদ করিলে ফসল যে খুব ভাল হইবে, সে বিষয়ে তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই সকল কথা সে দেবপালকে জানাইল। দেবপাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"অনেক দূর। এই একটারই সুবন্দোবস্ত করতে সব সময় চলে যায়। তবে তুমি যদি সেই বাগানটা চালাতে পার, তাহ'লে লাভের আধা-আধি তোমার।"

হরিচরণও তাহার এই সদয় প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া সরলভাবে উত্তর করিল,—"বেশ, আমিও রাজি আছি। ঐ বাগানের ভার আমি নিজের স্কন্ধে নেব। আমার সঙ্গে দু'একজন লোক দিন, দেখি, কতদূর কি করতে পারি। আমার বিশ্বাস, এ কাজও বেশ লাভজনক হবে।"

হরিচরণ নিজের কাজে চলিয়া গেল। পরদিন সে তিনজন লোক লইয়া সেই বাগানে যাত্রা করিল।

যাইবার সময় লুলিয়া হঠাৎ তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হরিচরণের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে তাকাইল। হরিচরণ সেই দৃষ্টির মর্ম্ম সম্যক্ অনুভব করিল। বলিল,—"লুলিয়া, তোমার শরীর বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে।"

লুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"হাঁ।"

লুলিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একবার তাহার পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর হইতে কি যেন একটা জিনিষ বাহির করিতে গেল। কিন্তু দু'এক মুহূর্ত্ত পরে সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রস্থান করিল।

হরিচরণকে নূতন বাগানে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। এই তিন সপ্তাহ অধীন লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঘরবাড়ী সব মেরামত

করিয়া তুলিল ; বেড়া উঁচু করিয়া দিয়া বাগানটি সুরক্ষিত করিল। জমির অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, এখানে পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে পারিলে, তাহাদের পরিশ্রম নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না। হরিচরণ মনিবকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য বাড়ী চলিল।

হরিচরণ বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই লুলিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইল। তাহার হাতে একখানি সংবাদ-পত্র।

"এই কাগজখানি আপনাকে দিতে চাই। আপনি এখান থেকে যাবার পূর্ব্বে একজন লোক এখানে এটা ফেলে গেছে। ইচ্ছে করলে পড়তে পারেন।"

"নিশ্চয়ই পড়বো ; এখানে দেশের সংবাদ-পত্র পড়বার সুবিধা বড় একটা পাওয়া যায় না।" এই বলিয়া হরিচরণ সংবাদ-পত্রখানি তখন না দেখিয়া, জামার পকেটে গুঁজিয়া রাখিল। জামা বদলাইবার সময় ভ্রমক্রমে উহা তাহার জামার পকেটেই রহিয়া গেল।

দেবপাল নূতন বাগানের বর্ত্তমান উন্নতি ও ভবিষ্যৎ আশার সম্ভাবনা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইল। বলিল, -"এ থেকে তোমার ভবিষ্যৎও বেশ উজ্জ্বল হবে।"

হরিচরণ সংবাদ-পত্রের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। আহারের পর ঘরে শুইতে গিয়া দেখে সংবাদ-পত্রখানি সেই জামাটার পকেট হইতে একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে। তখন কাগজখানির কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। দেবপাল তখনও বিছানায় শয়ন করে নাই। হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিয়া দেবপাল চমকিয়া উঠিল। একটু পরেই হরিচরণ সেই কাগজখানি হাতে

মুড়িয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ, নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত।

"আমাকে বাড়ী যেতে হবে। আমি কাগজে এই মাত্র এক অশুভ সংবাদ পড়েছি। আমাকে কিছুদিনের জন্য দেশে যেতেই হবে।"

(৬)

হরিচরণ কলম্বোতে গিয়া কলিকাতা-যাত্রী জাহাজে উঠিল। এই সমুদ্রযাত্রা তাহার নিকট বড়ই দুঃখজনক বলিয়া বোধ হইল। অনুতাপের তীব্র যন্ত্রণা তাহাকে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল। সে যদি এত একগুঁয়ে না হইয়া আরও বেশী সহিষ্ণু হইত, তাহা হইলে হয় ত পিতাপুত্রের মধ্যে এই বিচ্ছেদ নাও ঘটিতে পারিত। ইহা ভাবিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইল। কিন্তু হায়, এখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই।

তাহার শোকের বেগ এত তীব্র ও গভীর যে মৃত পিতা তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি কিরূপ বিলি করিয়া গিয়াছেন, সে বিষয় একবারও তাহার মনে উদিত হইল না। সে ভাবিল, পিতা যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের জন্য তাহাকে ত্যাজ্যপুত্রও করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাংশে ন্যায়সঙ্গত বিচারই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে চিন্তা তাহাকে বেশী বিচলিত করিতে পারিল না। মৃত পিতার চিন্তাতেই তাহার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল। দুঃখজনক অতীতের কথাই কেবল তাহার স্মৃতি সমুদ্রকে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। বিষয় সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা হইল, সে বিষয়ে ভাবিবার তাহার তত অবসরও ছিল না।

কিছুদিন পরে যথাসময়ে ট্রেনে চড়িয়া সে স্বদেশে আসিয়া পৌঁছিল।

তখন গোধূলি, ষ্টেশনে নামিয়া সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। ষ্টেসনের কুলীরা ও কর্ম্মচারীরা নূতন অপরিচিতের ন্যায় তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। এমন কি পিতার কারবারের কর্ম্মচারীরাও তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না।

সে একস্থানে দাঁড়াইয়া ছোট সহরটির দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল। অমনই অতীতের সুখদুঃখের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। এখানে আসিয়া সে যেন আপনাকে একান্ত নিঃসহায় বোধ করিল; সুদূর সিংহলের চা বাগানে বাসের সময়ও সে এতটা নির্জ্জনতা অনুভব করে নাই।

সে ভাবিতে লাগিল, কারবারেব লোকেরা, যাহারা এইমাত্র তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাহাকে তাহাদের মৃত প্রভুর পুত্র অমিয়কুমার বলিয়া চিনিতে পারিলে, কিরূপ আগ্রহ ও কৌতূহল সহকারে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাহাকে কিরূপ সাদর সম্ভাষণ করিত! সে ঠিক করিল যে, এখন আত্মপরিচয় দিবার পূর্ব্বে তাহার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বিষয় তাহাকে সম্যক্ জানিতে হইবে। তাহাকে হয় ত পুনর্ব্বার সমাজচ্যুত ও নিঃস্ব অবস্থায় মির্জ্জাপুর সহর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, আর তাহাই খুব সম্ভবপর!

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাহাব নয়নপথে পতিত হইল। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু সম্মুখের ফটক দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া চুপি চুপি বাগানের ভিতব

প্রবেশ করিল, সেখান হইতেই যদি বাড়ীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু টের পায়।

কিছুক্ষণ পরে উদ্যানস্থ বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠের রঙ্গিন কাচের জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে আলোক জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। সুললিত সঙ্গীত-ধ্বনি বায়ুভরে তাহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে আসিয়া" পৌঁছিয়া, তাহার ব্যথিত অন্তঃকরণে অনেকটা সান্ত্বনা ঢালিয়া দিল। সে বাগানের ফটকে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর যে নূতন, পরিচিত নহে ত! তাহার সময় বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী যেরূপ ভাবে গান করিতেন, তাহার অপেক্ষা এ গান যে খুব উচ্চ অঙ্গের। তবে কি এস্থানের সবই পরিবর্ত্তন হইয়াছে?

হরিচরণ মাথা নাড়িতে নাড়িতে ফটক খুলিল। ফটক খুলিবামাত্র এক বালিকা তাহার কাছে দৌড়িয়া আসিল। তাহার গায়ে ছোট জামা; অসংযত কেশরাশি লাল ফিতার মধ্য দিয়া তাহার পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে বালিকা-সুলভ কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, "রাম! দিদিকে বাড়ী আসতে বল, রাত যে অনেক হল।"

হরিচরণ বালিকাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। বলিল,—"আমার নাম রাম নয়। কোন দরকার থাকে ত আমাকে বলতে পারেন।"

বালিকা অপরিচিত লোক দেখিয়া ভীত হইল না। সেও নবাগত ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

"কিছু মনে করবেন না; আমি আপনাকে রাম বলে মনে করেছিলাম। না, আমার দরকার কিছুই নেই।"

বালিকা আগন্তুককে যথাযোগ্য সংবৰ্দ্ধনা করিল। হরিচরণের মুখের উপর পার্শ্বস্থিত আলোকের রশ্মি পড়িয়াছিল। সেই আলোকে বেলা দেখিল, আগন্তুক সুশ্রী যুবক। তাহাকে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি এস্থলে সম্পূর্ণ অপরিচিত?"

"হাঁ।" হরিচরণ বাস্তবিকই তখন আপনাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়াই অনুভব করিতেছিল।

বেলা তাহাকে আবার অভিবাদন করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। হরিচরণ কৌতূহল সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর উদ্যান ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

বাড়ীর ফটকে আসিয়া সে একটু থামিল। ভাবিল যদি তাহার পিতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্রই করিয়া বিষয় সম্পত্তি আর কাহাকেও দান করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সংবাদ বর্ত্তমান মালিকের নিকট হইতে লওয়া, দুইজনের কাহারও পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে না!

বিশেষ অনিচ্ছার সহিত সে সেইস্থান হইতে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ হাঁটিয়া সহরে গিয়া পৌছিল। কারবারের কুঠির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে আফিস-ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইল। সে বাড়ীতে এখন কে বাস করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। ঐ বাড়ীতেই যে তাহার জন্ম! ঐ স্থানের প্রতি তাহার স্বাভাবিক আসক্তি এই কৌতূহলকে আরও জাগাইয়া তুলিল। সে চিন্তিত ভাবে ঘরের দিকে তাকাইয়া রহিল, এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া এক লম্বা রোগা যুবক বাহির হইয়া আসিল। সে

হরিচরণের এত গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল, যে আর একটু হইলেই দুইজনের গা ঠেকাঠেকি হইয়া যাইত। কিন্তু যুবক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছে, হরিচরণের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখিল না।

হরিচরণ ভাবিল,—"হয় ত কারবারের নূতন গোমস্তা হবে। দেখছি এর মধ্যে সবই বদলে গেছে।"

এই রাস্তারই একটু দূরে একটি পুরাতন ধরণের বাড়ী সে দেখিতে পাইল। বাড়ীর সম্মুখেই মাঠ। মাঠটি কাঠের খুঁটি ও লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারা বেষ্টিত।

বাড়ীর দরজায় তাম্রফলকে উকিল গোপাল বাবুর নাম খোদা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া হরিচরণের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল।

সে দরজার নিকটে গিয়া দরজায় ঘা মারিল। একজন ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হরিচরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গোপাল বাবু বাড়ী আছেন?"

হরিচরণের পোষাক পরিচ্ছদ সামান্য হইলেও তাহাকে দেখিলেই ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। ভৃত্য সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি বাড়ী আছেন, আপনার নাম কি?"

হরিচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"হরিচরণ বাবু।"

ভৃত্য তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিতে বলিয়া প্রভুকে খবর দিতে গেল। হরিচরণ ইতিমধ্যে ঘরটির চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া লইল। দেওয়ালে তাহার পিতার এক বড় তৈলচিত্র ও রায়-বংশের তিন চারজনের ছোট ছোট ছবি সংলগ্ন রহিয়াছে। হরিচরণ একদৃষ্টে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এমন সময় বৃদ্ধ উকিল ঘরের

ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরে আলো তত জোর ছিল না; গোপাল বাবু আগন্তুককে প্রথম চিনিতে পারিলেন না।

গোপাল বাবু ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? বসুন, চেয়ারে বসুন।"

হরিচরণ চেয়ারে বসিয়া স্থির কৌতূহলপূর্ণ নয়নে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া রহিল। শেষে বলিল,—"গোপাল বাবু, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?"

গোপাল বাবু চসমার ভিতর দিয়া আগন্তুকের দিকে তাকাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হরিচরণ বাবু আপনার নাম? এ নাম ত আমার পরিচিত বলে মনে হয় না। আপনার কণ্ঠস্বর যেন চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে,—বাঃ! এ যে অমিয় বাবু!" তিনি আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত চেঁচাইয়া উঠিলেন এবং উঠিয়া দাড়াইয়া আন্তরিক প্রীতির সহিত হরিচরণকে আলিঙ্গন করিলেন।

"নিশ্চয়ই এখন আপনাকে বেশ চিনতে পেরেছি; কিন্তু আপনার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে! আপনি কিছু মনে করবেন না—আপনাকে একদম চিনবারই যো নেই। বয়সের সঙ্গে আপনার গাম্ভীর্য্যও ঢের বেড়েছে দেখছি। আপনাকে দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। এখানে কখন পৌঁছিলেন? আহার হয়েছে?"

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া জানাইল,—"হাঁ। আমি আহার করেছি, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

"তবে এক পেয়ালা চা আনুক, আপনাকে দেখে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে।"

তিনি চাকরকে চা আনিতে বলিয়া নিজের চেয়ারখানি হরিচরণের চেয়ারের পাশে টানিয়া লইয়া গেলেন।

"এতদিন পরে তা'হলে আপনি ফিরে এসেছেন। আপনাকে দেখে আজ বড়ই সুখী হয়েছি; আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হয়ে গেছে। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

"পান নি? আমি কলম্বোর ঠিকানায় পত্র পাঠিয়েছিলাম।"

"বোধ হয়, আপনার পত্র পৌছিবার পূর্ব্বেই আমি সেস্থান ত্যাগ করি।"

"জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পত্র পেয়েছিলেন ত?"

হরিচরণ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। তাহার চক্ষে আনন্দ, আরাম ও কৃতজ্ঞতা এই ত্রিবিধ ভাবের একত্র সমাবেশ হইল; সে বলিল, "না, তাঁর পত্রও ত পাই নি! তিনি কি তা হ'লে আমাকে পত্র লিখেছিলেন? সে সৌভাগ্য কি আমার হয়েছিল?"

"তিনি পত্র লিখেছিলেন—কলম্বোর ঠিকানায়।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনি কবে লিখেছিলেন?"

"গত বৎসর। আমি পত্রের ঠিক তারিখও বলে দিতে পারি।"

হরিচরণ মৃদুস্বরে বলিল—"আমি সে পত্র পাই নি।"

"এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! চিঠি না পাওয়ার কারণ ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আর চিঠি যদি আপনার হাতে পৌছিল না, তা হলে পোষ্ট আফিসের মারফৎ আবার এখানে ফিরে আসা উচিত ছিল।"

হরিচরণ আরও মৃদুস্বরে বলিল—"আমার পিতা তা হ'লে নিশ্চয়ই মনে করেছিলেন, যে আমি তাঁর পত্র পেয়েও উত্তর দিই নি।"

গোপাল বাবুকে অনিচ্ছাসহকারেও ইহা স্বীকার করিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"আমারও সেরূপ আশঙ্কা হয়। এ বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আপনি সে সময় কলম্বোতেই ছিলেন, বোধ হয়?"

"হাঁ ছিলাম। চিঠি সেখানে পৌছিলে নিশ্চয়ই আমার হস্তগত হ'ত।"

"আমি ত ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। অথচ ঘটেছে তাই। আর—"

চাকর চা লইয়া আসিল। তিনি পেয়ালাটি হরিচরণের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি কি আপনার পিতার উইলের কথা, বিষয় সম্পত্তি বিলির কথা কিছু শুনেছেন?"

"না, আমি এক খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ মাত্র পড়েছি। সে কাগজখানা দৈবাৎ আমার হাতে পড়ে। তার পরদিনই বাড়ী যাত্রা করি; কারও সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কোন সংবাদও আমি পাই নি, আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—"

গোপাল বাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তাই আমার কাছে এসেছেন। অমিয় বাবু আপনি এখানে এসেছেন, ভালই হয়েছে। ব্যাপার যে রকম, তাতে পৈতৃক ভবনে ঢুকতে আর আপনার ইচ্ছা হবে না।"

"ব্যাপারটা কি শুনতে পাই?"

গোপাল বাবু দাড়ীতে হাত দিয়া যুবকের সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুন্দর মুখের দিকে ভ্রুকুটির সহিত তাকাইলেন। বলিলেন,—"আমি যত সংক্ষেপে পারি, আপনাকে উইলের কথা বলছি, শুনুন।"

এই বলিয়া তিনি তাহাকে উইলের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন।

হরিচরণের মুখ একটু গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল। উকিলের নীরস কণ্ঠস্বর থামিবার পর সে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে একটু হাসিয়া বলিল,—“তাহলে আমি এখন ত্যাজ্য। অবশ্য এ কাজে আমি তাঁর একটুও দোষ দেখি নে। তিনি ঠিকই করে গেছেন। আমি তার কুপুত্র ছিলাম—”

গোপাল বাবু আলোচনার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন,—“অবশ্য দোষ দুদিকেই; কিন্তু আপনার পিতা যে পরে আপনার সব দোষ ভুলে গিয়ে আপনাকে ক্ষমা করবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এমন কি বড়ই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আপনাকে যখন পত্র লিখেছিলেন, তা হতেও আপনি সে বিষয় বেশ বুঝতে পারছেন!”

হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—“সেই চিন্তাই এখন আমার তীব্র অনুতাপের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। আমি তাহ'লে এখন আসি—”

গোপাল বাবু কাতরভাবে তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন। একটু বাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—“এ কি? এ ব্যাপারটাকে এভাবে নিলে চলবে কেন? আপনি এমন ভাবে চলে যাচ্ছেন, যেন সব কাজই শেষ হয়ে গেছে।”

হরিচরণ সরলভাবে উত্তর করিল,—“কাজ কি শেষ হয় নি?”

তিনি সজোরে উত্তর করিলেন,—“না, এখনও শেষ হয় নি; আপনি নিশ্চয়ই উইলের মর্ম্ম সম্যক বুঝতে পারেন নি। আপনি দেখতে পাচ্চেন

না, যে এই সম্পত্তির অধিকারী হতে গেলে, কেবল আপনার পিতার ইচ্ছা, এই উইলের সর্ত্ত অনুসারে আপনাকে কাজ করতে হবে। অবশ্য এটাও স্বীকার করি যে, এ সম্পত্তি বিনা সর্ত্তে আপনারই পাওয়া উচিত ছিল।"

হরিচরণ তাহার উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় উকিলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল,—"আপনি বলতে চান যে, আমি এই যুবতীকে বিবাহ করে বিষয়ের অধিকারী হব?"

গোপাল বাবু নির্ভয়ে জোরের সহিত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,— "নিশ্চয়ই। আবও দেখুন, উইলের সর্ত্ত পালন করা এমন কঠিন ব্যাপার নয়। এরূপ অবস্থায় সকলেই মনে করেন যে, এই সর্ত্ত থাকায় বিষয়ের মূল্য আরও ঢের বেড়ে গেছে। আপনার হয় ত যূথিকাকে মনে না থাকতে পারে!"

হরিচরণ এমন ভাবে তাকাইল, যেন যূথিকাকে স্মরণ করিবার সে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্মরণ করিতে না পারিয়া মাথা নাড়িল।

"তাঁকে আপনার স্মরণ নেই। একথা নিশ্চয়ই সত্য। আমি স্থির বলতে পারি, তাঁর অপেক্ষা সুন্দরী রমণী আমি এ অঞ্চলে জীবনে কখনও দেখি নি। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আরম্ভ করেন,—" তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন। দেখিলেন, হরিচরণ উঠিবার জন্য জামার বোতাম আঁটিতেছে। তাহার ওষ্ঠে চক্ষে ভীষণ হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছে। "দেখবেন, যেন নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করবেন না।"

"সে কথা আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে একথা জোর করে বলতে পারি যে, সুন্দরী হউক আর যাই হউক, আমি এত নীচ নই যে,

কাহাকেও বিবাহ করে আমি এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হব।"

এই কথা শুনিয়া গোপাল বাবু বড়ই রাগিয়া গেলেন।

"আচ্ছা দেখুন—" তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হরিচরণ তাঁহাকে হঠাৎ এক প্রশ্ন করিয়া থামাইয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, আমি যদি বিবাহের প্রস্তাব করি, আর যূথিকা আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হন, তাহলে তিনি কি এ বিষয় হতে বঞ্চিত হবেন?"

গোপাল বাবু তাঁহার ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন। রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি যে নির্ব্বুদ্ধিতা ও উন্মত্ততার পরিচয় দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তার সঙ্গে এ কথার সম্বন্ধ কি?"

হরিচরণ শান্তভাবে বলিল, "সে কথা আপনি ছেড়ে দিন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"হাঁ, তিনি বঞ্চিত হবেন। এবার আপনার মনের উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তিনিই বা কি করবেন ঠিক করেছেন? আপনি না বল্লেও, আপনার মুখ দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে অস্বীকার করেছেন। আপনি আমাকে এতই নীচ ভাববেন না যে সম্পত্তির লোভে আমি তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে তাঁকে বিষয়চ্যুত করবো? আমা হতে এ কাজ নিশ্চয়ই হবে না। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছি, যূথিকার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করব না।"

গোপাল বাবু ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিলেন। পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হরিচরণের উন্নত মূর্ত্তির দিকে রাগ ও অসহিষ্ণুতার সহিত তাকাইয়া বলিলেন,—"আমার বরাতে এত কষ্টভোগ, এত দুশ্চিন্তা কেন? এই বৃদ্ধবয়সে দুজন ছেলেমানুষ নির্ব্বোধ নিয়ে আমার কাজ; দুই-ই সমান নির্ব্বোধ, কিন্তু—" একটু হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"ভগবানের দয়া। অন্ততঃ এক বছর আপনি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করতে পারবেন না। তত দিনে হয় ত সৌভাগ্যক্রমে আমার মৃত্যুও ঘটতে পারে। আমাকে তখন এ সব আর দেখতে শুনতে হবে না, আর যদি বেঁচেই থাকি, তাহ'লে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখতে পাই।"

হরিচরণ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর টেবিলের কাছে গিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল,—"আমাকে আমার মনোভাব কাগজে কলমে লিখে দিতে অনুমতি দিন।"

একখানা চিঠির কাগজ লইয়া সে তাড়াতাড়ি অথচ ধীর ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিল। গোপাল বাবু বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"আপনি এখন ত্যাগপত্র লিখে দিতে পারেন না। বার মাস না গেলে এ সম্পত্তি ত্যাগ করবার অধিকার আপনার নেই। কেন বৃথা এ কষ্ট স্বীকার করছেন? যাহোক, আপনার পিতা তাঁর অস্বাভাবিক উইলে এই এক বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ করে গেছেন। ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, মাথা ঠাণ্ডা করে—অবসর মত ভেবে দেখবেন।"

হরিচরণ লেখা শেষ করিয়া কাগজখানি তাঁহার হাতে দিল।

কাগজখানি পড়িয়া গোপাল বাবুর মুখ হইতে বিশ্বাসের হাসিটুকু দূর হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়সূচক ভ্রুকুটি করিলেন।

হরিচরণ ত্যাগপত্র লিখিয়া পত্রের তারিখ তাহার পিতার মৃত্যুর তের মাস পর দিয়াছে।

বৃদ্ধ মস্তক নাড়িয়া বলিলেন,—"অমিয় বাবু, এ বড় চালাকি খেলেছেন বটে, কিন্তু—" তিনি পত্রখানি হাতে করিয়া অগ্নির দিকে অগ্রসর হইলেন।

"থামুন; আপনি যদি ও লেখা নষ্ট করে ফেলেন, তাহ'লে আমি আর একখানি লিখে যূথিকাকে ডাকে পাঠিয়ে দেব।"

গোপাল বাবু কাগজটুকু আর আগুনে ফেলিয়া দিলেন না। এই অদ্ভুত যুবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,—"দেখছি নিজের গলায় নিজে ছুরী বসাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। আর আমিও সাধ্যমত আপনাদের দুজনকেই এই কাজে বাধা দিতে সঙ্কল্প করেছি। অমিয় বাবু, মনে করে দেখুন, আমি আপনার পিতার উকিল ছিলাম, রায় বংশেরও সব কাজ করে এসেছি। অতীতের সেই সম্মান আজ আমাকে বজায় রাখতে হবে। আমার কর্ত্তব্য আমি নিশ্চয়ই সম্পাদন করবো এবং যদি সম্ভবপর হয়, তাহ'লে এই দু'জন নির্ব্বোধ তরুণবয়স্ক যুবক যুবতীকে দুঃখময় জীবন-যাপনের যন্ত্রণা-ভোগ হতে নিশ্চয়ই রক্ষা করবো।"

"আপনাকে এত বিরক্ত করলাম, বিবাহ করতে অস্বীকার করে আপনার মনে কষ্ট দিলাম, এ সবের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন; আমাকে এখন যেতে দিন।"

"আচ্ছা, আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন।"

গোপাল বাবু দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসিলেন।

"আমি যূথিকার এখনকার একটা ফটো খুঁজতে গেছলাম। আপনি তাকে বাল্যকালে দেখেছেন, তখন তাঁর শরীরের গঠন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি; এখন তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু এত খুঁজলাম, তাঁর ফটোখানি দেখতে পেলাম না।"

"অবশ্য ফটো দেখতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে আমার মতের কিছুই পরিবর্ত্তন হবে না। আমি বলি, ও অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আর আমাদের মধ্যে আলোচনা না হওয়াই ভাল। আমি যেমন অলক্ষিতে অপরিচিতের ন্যায় এ দেশে এসেছিলাম, সেই ভাবেই এ দেশ ত্যাগ করে যাব। তবে একটু হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য বিষয় সম্পত্তি বা অর্থের বিষয় আমি বিশেষ কিছু চিন্তা করি না, তার জন্য দুঃখও করছি না; আর এ কষ্টও এত তীব্র নয় যে, তা সহ্য করতে না পেরে জীবনের সব আশা ভরসায় একেবারে জলাঞ্জলি দেব। সে দেশে উন্নতি হবারও আমার বিশেষ সম্ভাবনা আছে; সেখানেই ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দেব।"

হরিচরণ সিংহলে ফিরিয়া যাইবার কথা বলিল। গোপাল বাবু কাতর ভাবে বলিলেন,—"না, এখনই যাবেন না; অন্ততঃ আরও কিছুদিন থাকুন।"

"না, এখানে থাকা হতে পারে না; আমাকে সেখানে যেতেই হবে।" বৃদ্ধ রাগে রুক্ষ কথা বলিয়া ফেলিলেন। এমন কর্কশ কথা সচরাচর

সহজে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় না। মানসিক চিন্তায় তিনি একটু অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গিয়াছিলেন। তারপর বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা নির্ব্বোধ শিশুরই উপযুক্ত! আমি যখন আপনার উকিল, তখন আমার নিকট থেকে কিছু টাকা ধার করে আপনি কিছুদিন এদেশে থাকুন। আপনি বোধ হয় আমার এ প্রস্তাবে অস্বীকার করবেন না?"

হরিচরণ অনিচ্ছা সহকারে উত্তর করিল,—"তা বেশ, আমি আপনার কাছ থেকে দু'শো টাকা ধার করে, যতদিন না সে টাকা খরচ হয়ে যায়, ততদিন আমি এ অঞ্চলে থাকতে প্রতিজ্ঞা করছি। তাহ'লে এখন আসি, আপনাকে এত কষ্ট দিলাম কিছু মনে করবেন না—হাঁ, আর একটা কথা, আমি যে এখানে এসেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, এ কথা বোধ হয় কাকেও বলবেন না।"

মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া গোপাল বাবু তাহার কথায় সম্মত হইলেন। বলিলেন,—"আচ্ছা, এ প্রতিজ্ঞা আমি করছি, আপনি যে এখানে এসেছিলেন, সে কথা কেউ জানবে না।" তিনি আরও ভাবিলেন, যদি তিনি যূথিকাকে বলেন যে, অমিয়কুমার তাঁহার সহিত গোপনে দেখা করিয়াছিল, তাহা হইলে সে যে যূথিকাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, একথাও বাহির হইয়া পড়িবে।

"হাঁ, আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনি বল্লেন, আমার পিতা কারবার ব্যবসা যা কিছু আমার খুড়তুতো ভাই নরেন্দ্রকে দিয়ে গেছেন। নরেন্দ্র কেমন ধরণের লোক?"

গোপাল বাবু ভ্রূকুটী করিলেন। বলিলেন,—"কি রকম লোক?

খুব চতুর যুবক, কাজকর্ম্মে খুব মাথা; কারবার থেকেই তাঁর বেশ উন্নতি হবে।"

হরিচরণ আনন্দসহকারে বলিল,—"তিনি ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি তাঁকে কখনও দেখি নি বটে, কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে তিনিই বোধ হয় আমার স্থান অধিকার করেছিলেন। বাবা তাঁকে কারবার দিয়ে খুব ভাল কাজই করেছেন। তা'হ'লে এখন আমি আসি।"

গোপাল বাবু হরিচরণকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ দরজায় দাড়াইয়া তাহার দীর্ঘ সুগঠিত মূর্ত্তি রাস্তার উপর দিয়া যাইতে দেখিলেন। পরে বাড়ী ঢুকিয়া তাহার বিষয়ই ভাবিতে লাগিলেন। অল্প পরিচয়েই মনুষ্য-চরিত্র তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন। অমিয়কুমার যে একজন সচ্চরিত্র যুবক, তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথা কহিয়াই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার মুখে, চোখে ও কণ্ঠস্বরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের চিহ্নমাত্রও নাই। সে সর্ব্বাংশেই পিতার উপযুক্ত পুত্র; তাহার বংশগৌরব, বিষয় সম্পত্তি ও ধন-রত্নের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এবং যূথিকার ন্যায় রমণীরত্নের স্বামী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত!

তিনি অধীরভাবে দুঃখের সহিত বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, —"নির্ব্বোধ একগুঁয়ে তরুণবয়স্ক যুবক!" এবং তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ বাহিরে লোকের পদশব্দ শুনা গেল। ভৃত্য ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল,—"নরেন বাবু এসেছেন। বল্লেন, বিশেষ দরকার আছে। আমি তাঁকে বৈঠকখানায় বসতে বলেছি।"

গোপাল বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে

আসিলেই, দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ হইত। তিনি ঘরের ভিতর একটু অপেক্ষা করিলেন। অমিয়কুমারের চিন্তাতেই তিনি তখন নিমগ্ন, অপর বিষয়ে মনোযোগ দিতে তত উদ্‌গ্রীব নহেন। পরে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র টেবিল হইতে অনেক দূরে আলোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

যথাযোগ্য অভিবাদনের পর নরেন্দ্র বলিল,—"অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, কিন্তু কি করি, বড় জরুরি কাজ।"

"তার জন্য আর কি? আপনাকে দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। আশা করি, আপনি এখন একটু সুস্থ হয়েছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের পাংশুমুখ ও জীর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের প্রতি তাকাইলেন।

"হাঁ এখন বেশ সুস্থ হয়েছি; আমাদের কুঠির সম্মুখে ঘোষেদের যে সম্পত্তিটা আছে, সেটা কিনতে পারলে বড় সুবিধা হয়। তাদের টাকার বড় দরকার।"

তাহারা দু'জনে বসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরে গোপাল বাবু বলিলেন,—"আমি কালই তাদের কাছে যাব। আপনি বসুন, একটু চা খেয়ে যান।"

নরেন্দ্র বিনীতভাবে চা পানে অসম্মতি জানাইল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে গোপাল বাবু চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে সম্মুখে তাকাইয়া রহিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"খুব কাজের লোক। দু'জনের মধ্যে এ বিষয়ে কত পার্থক্য! ও, বড় মনে পড়ে গেল, অমিয়কুমার যে ত্যাগপত্র লিখে দিয়ে গেল, সেটা গেল কোথায়। সেটা সাবধানে রাখতে হবে বা নষ্ট করে ফেলতে হবে। কি করা যায়?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেবিলের উপর যেখানে তিনি সেই পত্রখানি

ফেলিয়াছিলেন, সেখানে খুঁজিতে লাগিলেন। সেখানে পত্র নাই। নানাপ্রকার দলিল কাগজপত্রাদি উল্টাইয়া দেখিলেন। কিন্তু সে কাগজ কোথায়, যাহার দ্বারা অমিয়কুমার এই বিশাল সম্পত্তি, বিপুল ধনরত্ন স্বেচ্ছায় লোষ্ট্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া গেল ? তিনি টেবিলের উপর যেখানে কাগজখানি রাখিয়াছিলেন, সেইদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

"এ ত বড়ই আশ্চর্য্য !" তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি শপথ করে বলতে পারি ঠিক ঐখানেই সেখানি রেখেছিলাম। যখন যূথিকার ফটো খুঁজতে যাই, তখনও আমি সেটা ওখানে দেখেছি। ওঃ !" এমন সময় একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া তাঁহার মুখ হইতে অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি একটু হাসিলেন।

"তাই হয়েছে ! নিশ্চয়ই তাই। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর বোধ হয় অমিয়কুমার তাঁর মনের ভাব পরিবর্ত্তন করে কাগজখানি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" তখন ছেঁড়া কাগজ ফেলিবার ঝুড়িটা হাতড়াইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর কাগজের ছিন্ন অংশ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, "হয় ত বা পুড়িয়ে ফেলেছেন।" আলোর কাছটা একবার লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু ভস্মীভূত কাগজের ছাইয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। "হয় ত বা মনের ভাব এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায় লজ্জায় সেটা সঙ্গে করেই নিয়ে গেছেন। ঠিক সেইটেই বিশ্বাস হচ্ছে। তাহ'লে দেখছি এখনও আশা আছে।"

নরেন্দ্র ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল, পরে ঘরের দরজা

বন্ধ করিয়া আলোর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং চিন্তিতভাবে আলোকের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে তাহার বুক-পকেট হইতে ভাঁজ-করা এক টুকরা কাগজ সযত্নে বাহির করিল। এই কাগজটুকু সে গোপাল বাবুর বৈঠকখানার মেজেয় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। হরিচরণকে সঙ্গে করিয়া দরজায় পৌঁছিয়া দিবার সময় গোপাল বাবু উহা মেজের উপরেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কাগজটুকু টেবিলের উপর তুলিয়া রাখিবার জন্য মেজে হইতে কুড়াইয়া লইয়াছিল, কিন্তু কাগজের উপর একবার চোখ বুলাইয়া অমিয়কুমারের নাম দেখিয়া সে আকৃষ্ট হয়। কাগজখানি আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িবার লোভ সংবরণ কবিতে পারে নাই। কাগজটুকু পড়িয়া তাহা হস্তগত করিবার ইচ্ছা তাহার প্রথমে হয় নাই; প্রলোভন দূর করিবার জন্য সে অনেক চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু শেষে প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে নাই। কাগজে লিখিত কথাগুলির সহিত যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ ঘনিষ্টভাবে জড়িত! সে সেটুকু পকেটের ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়াছিল।

বাড়ীতে আসিয়া দ্বিতীয়বার সে কাগজটুকু পড়িল। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইলেও পড়িতে কিছু কষ্ট হয় না। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—

"আমি, অমিয়কুমার যূথিকাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়া পিতার উইলের সকল দাবি এতদ্দ্বারা ত্যাগ করিতেছি!" পত্রের তারিখ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মৃত্যুর তের মাস পরে।

নরেন্দ্র সেটুকুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভ্রূযুগলে চিন্তা ও কল্পনার রেখা স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া উঠিল।

"এ কাগজ ওখানে কেমন করে এল ?" সে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল। কাগজখানি উল্টাইয়া আলোর নিকট ধরিল। "ডাকে এসেছে ? এটা ভাঁজ-করা রয়েছে বটে। নিশ্চয়ই তাই হবে। তাহ'লে সে এ বিষয় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে—কি নির্ব্বোধ !"

সে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের কলসীর দিকে একবার তাকাইল।

"মহামূল্য দলিল ; অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ !" সে ইহা পুনর্ব্বার পড়িল। তারপর পত্রখানি খামে পুরিয়া গালা সিল করিয়া দেয়াল-সংলগ্ন আলমারির ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার মনে হইল যেন সৌভাগ্যদেবী তাহার প্রতি ক্রমেই প্রসন্ন হইতেছেন।

(৭)

বাগানে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ভদ্রতার আদান প্রদান করিয়া বেলা বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠের ভিতর গিয়া বসিল। হাতের উপর দাড়ী ও জানুর উপর কনুই রাখিয়া বিস্মিতভাবে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সে তখন সেই অপরিচিত সুশ্রী যুবকের কথাই ভাবিতেছিল। এরূপ ভাবে সন্ধ্যার সময় বাগানের নিকট কে যুবক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা ! সে ভাবিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কে, সেখানে কেনই বা ঘুরিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে যূথিকা যখন বাদ্যযন্ত্র বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিল, বেলা তাহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, তুমি যখন এ ঘরে এসেছিলে, তখন কাকেও পথে দেখতে পেয়েছিলে ?"

গান বাজনায় নিমগ্ন থাকায় যূথিকা এতক্ষণ যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ

করিতেছিল। বেলার প্রশ্নে তাহার চৈতন্য হইল। বলিল,—"না, কেন বল দেখি?"

"না, হয় নি কিছু; আমি দেখলাম, অন্ধকারে একজন যুবা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি তাকে দেখেছ কি না! কি আশ্চর্য্য! চল দিদি, বাড়ী যাই।" সে কাঁপিতে কাঁপিতে যূথিকার হাত ধরিল। তাহার দৌড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু যূথিকা তাহার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইল। হাসিয়া বলিল,—"আমি ত দৌড়ুতে পারব না।"

বেলা সমস্ত পথ বকিতে বকিতে আসিল। কিন্তু একটা জিনিষ সে লক্ষ্য করিল যে, যূথিকা বাহিরে যতটাই প্রফুল্লভাব ধারণ করুক, তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। তবে কি যূথিকার মনে আদৌ শান্তি নাই? তাহার কি কোনও অসুখ করিয়াছে? সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যূথিকাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়। বেলা মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিল।

পরদিন প্রাতে সে দিদিকে জানাইল যে, তাহার জ্বর হইয়াছে। তাহার কোমল গণ্ডস্থল হাতে ঘষিয়া লাল করিয়া বলিল,—"আসল ম্যালেরিয়া জ্বর!"

যূথিকা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার হরনাথ বাবুকে সংবাদ দিতে লোক পাঠাইল। বেলা অন্য সময় সামান্য পীড়িত হইলে, ডাক্তার ডাকিবার কথায় অসম্মতি জানাইত। এবার ডাক্তার

আনিবার কথায় কোন দ্বিরুক্তি করিল না, অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—"তুমি যা ভাল বোঝ, কর।"

ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা যূথিকাকে পূর্ব্বে রোগের যেরূপ বিবরণ দিয়াছিল, যূথিকা ডাক্তারের নিকট সে সব যথাযথ বর্ণনা করিল।

ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে বেলার দিকে তাকাইতে, সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"আমার রোগই হয় নি। আমার অসুখের কথা একটা অছিলা মাত্র। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি দিদিকে একবার ভাল করে দেখুন; সে নিজের অসুখের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠাবে না, এ কথা আমি বিলক্ষণ জানতাম।"

যূথিকা লজ্জিত ও রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "বাস্তবিক বেলা—"

ডাক্তার বাবু মুহূর্ত্তের জন্য বেলার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বেলাকে অতীব চতুর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তারপর যূথিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"উনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে বেশ সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। বোধ হয় সম্প্রতি মানসিক চিন্তার বেগ একটু বেড়েছে। আপনার একটু স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এসেছে মনে হয়।"

বেলাও বিশ্বস্ত ভাবে বলিল,—"আপনি রোগ ঠিক ধরেছেন।"

ডাক্তার বাবু গম্ভীরভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি এই যে অযাচিত ভাবে আমার কথার অনুমোদন করলেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

বেলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য টনিক ওষুধে কিছু হবে না। আমি সে ওষুধ দিয়ে দেখেছি, কোন ফল হয় নি। গত সপ্তাহে রোজ আমি তার চায়ে নাক্স-ভমিকা দিয়ে আসছি।"

"এ যে দেখছি, খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হবার যোগাড় করেছেন। এ বড় ভাল কথা নয়,—"তারপর যূথিকার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"এঁকে কোন বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন না কেন?"

বেলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"কারণ ও যেতে চায় না।"

ডাক্তার বাবু তখন যূথিকাকে বলিলেন,—"আপনার দরকার হাওয়া পরিবর্ত্তন। এই স্থান, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সবই পরিবর্ত্তন করতে হবে, আর মানসিক উদ্বেগ একেবারে মন হতে দূর করতে হবে। আচ্ছা ভেবে দেখি, কোথাকার জল হাওয়া আপনার সহ্য হবে।" তিনি ভাবিতে লাগিলেন। বেলা বাহ্যতঃ ধৈর্য্য দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যূথিকার তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে সে মুখ গম্ভীর করিয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। "হাঁ, মনে পড়েছে, বাল্যকালে আপনার শরীর অসুস্থ হলে, আমি আপনাকে বিন্ধ্যাচলে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠিয়ে দিতাম। সেখানের জল হাওয়া আপনার খুব সহ্য হত, আপনার সে কথা স্মরণ আছে কি?"

বেলা হাততালি দিয়া কহিল "অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই সুন্দর পরিচিত স্থান! বালুকাময় নদীতীর, পর্ব্বতগাত্রে সুন্দর পত্রপুষ্প, বৃক্ষ-পরিপূর্ণ জঙ্গল! বায়ু পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত স্থান। দিদি চল, আমরা সেখানেই যাই! এমন কিছু দূরও নয় ত!"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তা আপনি সেখানেই যান, শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।"

বেলা বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, সেই কথাই ঠিক ; আপনি গোপাল বাবুকে বলবেন, তিনি যেন বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে সেখানে আর দিদিকে জ্বালাতন না করেন।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য !"

বেলা এই বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে একটুও দমিয়া না গিয়া নির্ভীকভাবে বলিল,—"আমি আপনাকে বড়ই পছন্দ করি ; আপনি বড় বুদ্ধিমান। আমি এখনি খপর পাঠাচ্ছি। কাল বা পরশুই আমরা সেখানে যাত্রা করব। দিদি খুব মোটা হয়ে আসবে। তখন আপনিও বলতে পারবেন, আপনার চিকিৎসাগুণেই রোগী কিরূপ আরোগ্য লাভ করেছে।"

ডাক্তার বাবু বেলাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আপনাকে দেখছি রোগ সারাবার জন্য প্রথম কিছু ওষুধ খাওয়ান দরকার।"

"আপনাদের ওষুধের যা গুণ তা আমার বেশ জানা আছে ; একবার আমি একবোতল ওষুধ ফুলের টবে ঢেলে দিয়েছিলাম। গাছটা পুড়ে মরে গেল।"

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে, বেলা তাহাদের যাত্রার সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

* * * *

যাত্রার সব বন্দোবস্ত করিতে তিন দিন সময় লাগিল। যে বাড়ীতে তাহারা যাইতেছিল, সেখানে তাহাদের বাসের জন্য ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দেওয়া

হইয়াছিল। তৃতীয় দিনের দিন, সন্ধ্যাবেলা তাহারা দুইজনে মির্জ্জাপুর পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্যাচলে গিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটি বড়ই নির্জ্জন ও রমণীয়।

বাড়ীটি এক প্রকাণ্ড পুরাতন ধরণের বাড়ী। বেলা বৈঠক্খানা ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া তাহার সন্তোষ জানাইল।

"ঠিক যেমনটি তুমি চাও, দিদি। কোন জাঁকজমক নেই, আদব কায়দা নেই, বেশী চাকরবাকর নেই; তবে আমি কিন্তু বাড়ীতে চাকর বাকর রাখার বড় পক্ষপাতী। আরও ভাল যে এখানে গোপাল বাবু ও তাঁর কাগজপত্র নেই; আর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক যে নরেন্দ্রবাবুও এখানে রোজ জ্বালাতন করতে আসবেন না। দিদি, বসে বসে কি ভাবছ?"

যূথিকা উন্মুক্ত জানালা দিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া ছিল। প্রশান্ত নদী, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মিপাতে উজ্জ্বল নীলকান্তমণির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। এ দৃশ্য দর্শনে সে একটু চমকিয়া উঠিল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিল,—"আমি ভাবছিলাম এখানে চিরকালের মতন থাকলে ভাল হয়।"

"সেটা তোমার ভাল লাগতে পারে; আর এ জায়গাটা বছরের এই সময়েই বেশ ভাল লাগে; কিন্তু আমি মির্জ্জাপুরের বাড়ীতে চিরকাল থাকতে পেলে আর কিছুই চাই না।"

যূথিকার সে রাত্রে গভীর নিদ্রা হইল। বেলা তাহার প্রতি বিশেষ নজর রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে বেলার মনে হইল যূথিকার গণ্ডদেশ যেন একটু রক্তাভ হইয়াছে।

জলযোগ করিবার পর বেলা যূথিকাকে জোর করিয়া নদী-তীরে টানিয়া লইয়া গেল। কতকগুলি ধীবর তাহাদের নৌকা সারিতেছিল, কেহ কেহ বা জাল ঝাড়িতেছিল। তাহারা ভগ্নীদ্বয়কে আন্তরিক সরলতার সহিত সম্বর্দ্ধনা করিল।

"বাতাস ত একেবারে বন্ধ দেখছি ; এ সময় নৌকায় বেড়ান মন্দ হবে না। এখানে কোন মাঝি নেই যে, আমাদের নৌকায় চাপিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে আসে?" এই বলিয়া বেলা আশে পাশে একবার তাকাইল।

একজন যুবক সামান্য পোষাক পরিয়া একখানি নৌকার উপর বসিয়াছিল। সে পূর্ব্ব হইতেই যুবতীদ্বয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। বেলা তাহার নিকট গিয়া ধীর এবং সরলভাবে বলিল,- "আমাদের খানিকটা ঘুরিয়ে আনবে?"

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র বালিকার দিকে তাকাইয়া উত্তর করিল,— "বেশ ত আসুন না।" এই বলিয়া সে নৌকা খানিকে টানিয়া জলে নামাইল।

বেলা যূথিকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল,— "লোকটা নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।" যূথিকা তখন এক উপলখণ্ডের উপর বসিয়া নদীর দিকে তাকাইয়াছিল।

উভয়ে নৌকায় উঠিলে যুবক নৌকা খানি স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দিল।

বেলা বলিল,—"বেশী দূরে যেও না। আর তীরের ধার দিয়ে দিয়ে চল," বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল ; যুবকের মুখের দিকে একবার তাকাইল। ভাবিল, ইহাকে কি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি? পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর করিল,— "হরিচরণ দাস।"

"তা বেশ, বেশী দূর যেও না, হরিচরণ" বেলা হঠাৎ এই কথাগুলি বলিয়া হাই তুলিল।

হরিচরণ তীরের ধার দিয়াই নৌকা কিছুদূর বাহিয়া চলিল। তাহার মুখে একটিও কথা নাই।

সেও গোপাল বাবুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শান্তির অন্বেষণে এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যুর সময়ও পিতাপুত্রের মধ্যে যে মনোমালিন্য বর্ত্তমান ছিল, তাহার জন্য সে বড়ই অনুতপ্ত। সেই অনুতাপানল হইতে শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় সে এই মনোরম নিরাবিল নদী-উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কেহ পাছে তাহাকে চিনিতে পারে এই ভয়ে সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। নদীবক্ষে বেড়াইতেও হরিচরণ খুব ভালবাসিত। কিছুদিনের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সে নিজেই দাঁড় টানিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এ প্রদেশের লোকেরা তাহাকে এখানে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিত বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে। কেহই তাহার আসল পরিচয় পায় নাই। দু'এক জন স্থানীয় বৃদ্ধ লোক তাহাকে বাল্যকালে এই নদীতীরে খেলা করিয়া বেড়াইতে দেখিলেও এখন আর তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

হরিচরণ পূর্ব্বে শুনে নাই যে, যূথিকা ও বেলা এখানে আসিয়াছে। মাঝি মনে করিয়া তাহারাই যে তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহা সে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। তাহাকে সাধারণ মাঝি বলিয়া জ্ঞান করায় সে আদৌ বিরক্ত হয় নাই, বরং আনন্দিতই

হইয়াছিল। সে মনে মনে তাহার ছদ্মবেশের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং ভাবিল, প্রাতঃকালে একলা নৌকা ভ্রমণে বাহির হওয়া বা নদীতীরে বিষণ্ণভাবে বসিয়া দুঃখজনক অতীতের বিষয় চিন্তা করা অপেক্ষা এ কাজ বেশী আরামপ্রদ।

যূথিকা নদীর উভয় তীরবর্ত্তী কুটীর সমূহের দিকে তাকাইয়াছিল। হরিচরণ নৌকা বাহিতে বাহিতে মধ্যে মধ্যে তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—"দু'জনেই সুন্দরী—বড়টি কিছু বেশী সুন্দরী। একে যেন কোথায় দেখেছি মনে হয়, কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। বোধ হয় এর কোন আত্মীয় মারা গেছে, তা না হলে এত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল-ভাবে বসে থাকবে কেন? এরা বোধ হয় এদেশে বেড়াতে এসেছে।"

বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমে জলচর পক্ষিকুল বিশেষতঃ বলাকাশ্রেণী নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদু-বায়ু-ভরে আন্দোলিত হইতেছে। হরিদ্বর্ণ শুক পক্ষীর ঝাঁক প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বল আলোকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্ব্বতশিখর-স্থিত উচ্চ-বৃক্ষচূড়াবলম্বী ময়ূরের কেকারবে বনপ্রান্ত মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বেলা ঘাড় নীচু করিয়া জলে আঙ্গুল টানিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বড়ই রমণীয়! তুমি কি মনে কর পৃথিবীতে এমন সুন্দর আর দুটি স্থান আছে?"

যূথিকা চারদিকে একবার তাকাইয়া বলিল,—"আমার মনে হয় এরূপ সুন্দর স্থান আরও আছে।"

"আমার ত সন্দেহ হয়।"

তারপর হরিচরণের দিকে তাকাইয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি কখনও বিদেশ ভ্রমণে গেছ?" সে এত দ্রুতভাবে হরিচরণকে এই প্রশ্ন করিল যে, হরিচরণের চৈতন্য হইল, এরূপ এক দৃষ্টিতে যূথিকার দিকে তাহার তাকাইয়া থাকা ভদ্রতাসঙ্গত নহে।

"হাঁ, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, এ স্থানও সুন্দর বটে, তবে পুরীর সমুদ্রতীর,—বোম্বাই বন্দর—"

তাহার গলার স্বর সাধারণ মাঝির কণ্ঠস্বর হইতে এত স্বতন্ত্র যে, তাহার প্রতি যূথিকার মনোযোগ স্বতঃই আকৃষ্ট হইল।

বেলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, -"হরিচরণ, তুমি কি এখানেই বাস কর?"

"হাঁ, বর্ত্তমানে এখানেই আছি। মাত্র দু'এক সপ্তাহ এখানে এসেছি।"

"তুমি তাহ'লে এই দাঁড়িমাঝির কাজই কর?"

"হাঁ", সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল।

যূথিকা চুপি চুপি বেলাকে নীরব হইতে বলিল। বেলাও কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরই তাহার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

"তোমার বোধ হয় কোন বন্ধু বা আত্মীয় এখানে আছে।"

"না, আমি বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে পড়েছি।"

"এ কথা পূর্ব্বে বল নি কেন? যখন আমি তোমাকে নৌকা করে আমাদের বেড়িয়ে আনতে বল্লাম, তখন জানাতে হয়।"

সে হাসিয়া উত্তর করিল,—"এ ত কাজের মধ্যেই গণ্য নয়!" বেলার চতুর কথাবার্ত্তায় হরিচরণ তাহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

"তোমাকে কত কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করো না।"

হরিচরণ ভদ্রভাবে উত্তর করিল,—"না, তা ভাববেন না। আজ প্রভাতের এ দৃশ্য বড়ই মধুর বলে মনে হচ্ছে। আপনারাও বোধ হয় সেটুকু বেশ উপভোগ করেছেন?"

"হরিচরণ, তুমি কি বিবাহ করেছ?"

যূথিকা এবার তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে বেলার দিকে তাকাইল।

হরিচরণ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "না।" এবার অনেক কষ্টে তাহাকে হাসি চাপিয়া রাখিতে হইল।

"এ কথা জিজ্ঞাসা করেছি বলে, কিছু মনে কর না।"

যূথিকা এই কথাবার্ত্তার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য বলিল,—"বেলা, আমাদের বাড়ী ফিরে যাবার সময় হয়েছে বোধ হয়?"

"না যূথিকা, আর একটু পরে।"

হরিচরণ দাঁড় টানিতেছিল। নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাহার বাম হাত হইতে দাড়টি সশব্দে জলে পড়িয়া গেল।

"কিসের শব্দ?"

"না—কিছুই নয়।" এই বলিয়া হরিচরণ লজ্জিত হইয়া দাড়টি জল হইতে তুলিয়া লইল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যূথিকা! যূথিকা! তাহা হইলে ইনিই যূথিকা, যাঁহার সঙ্গে তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উইলেও সে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সে কি নির্ব্বোধ! সেই যূথিকাকে সে আদৌ চিনিতে পারে নাই! সে লুকাইয়া একবার তাহার প্রতি তাকাইল এবং এবার নামটি জানিতে পারায় তাহাকে ঠিক চিনিতেও পারিল। এই কি সেই

বালিকা, যাহার সঙ্গে বাল্যকালে সে নিঃসঙ্কোচে খেলা করিয়া বেড়াইত? ইহা অসম্ভব! সে এখন কিরূপ সুন্দরী যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তাহারও চেহারার নিশ্চয়ই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে যূথিকাও তাহাকে দেখিয়া আদৌ চিনিতে পারে নাই।

এই চিন্তায় সে একটু বিচলিত হইল। অবশ্য ইহাতে তাহার কি আসে যায়? সুরূপা বা কুরূপা—সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। বিবাহ করিবে না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যাহা হউক তাহাকে দেখিয়া আজ তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, সে তাহার পৈতৃক বাসভবন ও বিষয় সম্পত্তির সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত অধিকারিণী হইবে। যূথিকার শরীর অসুস্থ। পাছে ঠাণ্ডা লাগিলে অসুখ বাড়ে, এই ভয়ে বেলা চিন্তিত হইল। সে হরিচরণকে নৌকা ফিরাইতে বলিল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেস্থানে ফিরিয়া আসিল।

<u>সমুদ্রে ভাটা পড়িয়াছে</u>। তীর কর্দ্দমাক্ত। ভগিনীদ্বয় হাঁটিয়া যাইতে গেলে কাদায় তাহাদের পা ভর্ত্তি হইয়া যাইবে। হরিচরণ দাঁড়ে ভর দিয়া তীরে লাফাইয়া পড়িল এবং যতদূর পারিল, নৌকাখানিকে তীরের দিকে টানিয়া আনিল। কিন্তু সে স্থানও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। হরিচরণ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া নৌকার পাশে গিয়া তাহার বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া দিল।

বেলা এত জোরে তাহার কোলে লাফাইয়া পড়িল যে, হরিচরণ বলবান না হইলে তাহাকে মাটিতে ঠিকরাইয়া পড়িতে হইত। হরিচরণ তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া যূথিকাকে লইয়া যাইতে আসিল। যূথিকা নৌকার উপর দাঁড়াইয়া কি করিবে ভাবিতেছিল।

হরিচরণকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল,—"আগে এখানে তীরে নামবার জন্য একটা তক্তা ফেলা ছিল না?"

হরিচরণ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল,—"এখন ত কিছুই দেখছি না।"

যূথিকা আর কি করে?

হরিচরণ তাহাকেও কোলে তুলিয়া লইল। সে বেলার অপেক্ষা সামান্য একটু ভারি, কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তাহাকে স্পর্শ করিতেই হরিচরণের অন্তঃকরণ কাঁপিতে লাগিল। সে এক অদ্ভুত ভাব হৃদয়মধ্যে অনুভব করিল। অবশ্য বাহিরে তাহা কিছু প্রকাশ পাইল না। সে বাহ্যতঃ স্বচ্ছন্দ ও উদাসীনভাবে তাহাকে শুষ্ক স্থানে লইয়া গেল। যূথিকা বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া শান্তভাবে বলিল,—"তোমাকে কত কষ্ট দিলাম।" তাহার মানসিক উত্তেজনারও কোন কারণ ছিল না।

হরিচরণ তাহার হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহাদের অভিবাদন করিয়া নৌকায় ফিরিয়া যাইতেছিল, বেলা তখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"ভুলে গেছলাম, কিছু মনে কর না।" এই বলিয়া সে তাহার পকেটে হাত দিল। পরে যূথিকার সহিত দু'চার কথা বলিয়া তাহাকে বলিল,—"দেখ, আজ আমাদের কাছে কিছুই নেই। তোমার পারিশ্রমিক দিতে পারলাম না, কাল দিয়ে যাব।"

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও হরিচরণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সেও ভদ্রভাবে বলিল,—"তার জন্য কিছু এসে যায় না। কাল কি আপনাদের আমাকে দরকার হবে?"

বেলা যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—"তা ঠিক করে বলতে

পারি নি। হলেও হতে পারে। তুমি এখানেই থেক। আমরা খবর পাঠাব।" পরে যূথিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দিদি চল, ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

হরিচরণ নৌকাটিকে যথাসাধ্য তীরের উপর টানিয়া আনিল। পরে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেইখানে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

সে ভাবিতে লাগিল ;—এ ঘটনা বড়ই রহস্যময়! সে মাঝির ছদ্মবেশে তাহার নির্ব্বাচিত পরিত্যক্তা পত্নীর সেবা করিতেছে। একদিন হইল, তাহাই ভাল। এবার তাহার এ স্থান ত্যাগ করা উচিত নহে কি? কেনই বা সে এখানে থাকিয়া এ সকল যন্ত্রণা ভোগ করিবে? সিংহলে তাহাকে সবাই সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সেখানে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতিরও বিশেষ সম্ভাবনা। সে ভিক্ষুকের ন্যায় নিঃস্বও নহে। আব এখানে -

কিন্তু তাহাকে তাহাদের কাল আব দরকার হইবে কি না, এ কথা সে নিজেই স্বেচ্ছায় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। বেলা তাহাকে এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলিয়াছে। এই কৌতুকজনক ব্যাপারের বিষয় ভাবিয়া সে মনে মনে খুব হাসিতে লাগিল। তখন দুই বোনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বেলাকে তাহার খুবই পছন্দ হইয়াছে। মির্জ্জাপুরে বাগানেই হরিচরণ তাহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিল। তাহা হইলে সে রাত্রে বাগানের ভিতর যূথিকাই বোধ হয় পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। যূথিকা তাহার সহিত দু'চারিটীর বেশী কথা কহিয়াছে কিনা সন্দেহ, তবুও বেলা অপেক্ষা যূথিকাকেই তাহার বেশী পছন্দ হইল। যূথিকার এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহার মনে হইল

যেন সে যূথিকার সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিতেছে। যূথিকা সভ্য ও নম্র, অথচ এই কোমলতার মধ্যেও তাহার মনের জোর সে স্পষ্ট অনুভব করিল।

পিতার সহিত তাহার ঝগড়া না হইলে, যদি সে দেশে থাকিয়া যূথিকার সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ তাহার সহিত—! হঠাৎ সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। রাগান্বিত ভাবে হরিচরণ বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি এমনই বোকা যে, এ সব বিষয় এখনও চিন্তা করছি। এ হলে কি হত, ও হলে কি হত, সে বিষয়ে চিন্তা করে কি ফল? আমি যা করবার, তা স্থির সিদ্ধান্ত করেছি, তার নড়চড় হবার নয়। আমার এখন উচিত, এ দেশ ত্যাগ করা, সিংহলে গিয়ে কাজকর্ম্মে মন দেওয়া। যূথিকা নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করে এই সম্পত্তির যোগ্য অধিকারিণী হবে।"

এমন সময় যে কুটীরে সে বাসা লইয়াছিল, সেই কুটীরের গৃহকর্ত্রীর এক ছোট মেয়ে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "মা আপনাকে খুঁজতে পাঠালেন; খাবার তৈরি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"চল, যাই" এই বলিয়া সে বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল।

হরিচরণ স্থানীয় এক বিধবার গৃহে বাসা লইয়াছিল। ইন্দু তাহার একমাত্র সন্তান। মাতা ও কন্যা দুইজনেই হরিচরণকে খুব ভালবাসে ও যত্ন করে।

হরিচরণ কুটীরে উপস্থিত হইতেই গৃহকর্ত্রী তাহাকে আহারে বসিতে বলিল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া ইন্দুকে পিঠে লইয়া

নদীতীরে চলিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে বেলা ও যূথিকার সহিত তাহার দেখা হইল। তাহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। যূথিকা হরিচরণের পৃষ্ঠোপরি বালিকার দিকে তাকাইয়া একবার মাত্র হাসিল। কিন্তু বেলা হরিচরণের নিকটে আসিয়া বালিকাকে বলিল,—"তুমি দেখছি বেশ ঘোড়ায় চড়ে চলেছ!"

ইন্দুও গর্ব্বভরে উত্তর করিল,—"এমন ভাল ঘোড়া কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।"

হরিচরণ বিড় বিড় করিয়া বলিল,—"ঘোড়া নয়, গাধা বল! তাহ'লেই ঠিক হবে!"

বেলা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, হরিচরণ তোমাকে কাল বিকাল বেলা আমাদের দরকার হবে। সব ঠিকঠাক করে রেখ।"

"নিশ্চয়ই রাখব।"

বেলা চলিয়া গেল, হরিচরণ তাহাদের দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি যূথিকার মূর্ত্তির উপরই নিবদ্ধ। রমণীয় পোষাকে তাহাকে সেদিন বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। এমন সময় হরিচরণ দেখিল, একজন অশ্বারোহী যুবক সে দিকে আসিতেছে। যুবকের মুখ দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল, মির্জ্জাপুরে সেদিন রাত্রে গোপাল বাবুর বাড়ী যাইবার পথে ইহারই সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে ইন্দুর মাও নদী হইতে জল লইবার জন্য পাত্রহস্তে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হরিচরণ অশ্বারোহী যুবককে দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যুবককে আপনি চেনেন?"

"চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে,—হাঁ,—ইনি হচ্ছেন নরেন বাবু, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ভাইপো।"

(৮)

নরেন্দ্র এরূপ মুখভঙ্গী করিল যেন, যুবতীদ্বয়কে এ স্থানে দেখিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়াছে, যেন তাহাদের সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অথচ সে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতেই শুনিয়াছিল যে, ইহারা বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছে এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করাই এখানে আসার তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সে যূথিকার নিকট অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"এ মিলন স্বপ্নেরও অগোচর! আমি আমাদের একজন কর্ম্মচারীকে দেখতে এসেছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে সে হঠাৎ আহত হয়। তাকে এখানে সুস্থ হবার জন্য পাঠিয়েছি।"

"এ আপনার সহৃদয়তারই পরিচয়!" যূথিকা উত্তর করিল।

এমন সময় বেলা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। নরেন্দ্র তখন তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিল,—"আপনি কেমন আছেন?"

তাহারা কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। নরেন্দ্র কথা কহিতে যেরূপ পটু, অশ্বারোহণে সেরূপ দক্ষ ছিল না। হঠাৎ নরেন্দ্রের ঘোড়াটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বাগ মানাইতে পারিল না। ইন্দু সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। ঘোড়াটি আসিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িল। সে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। হরিচরণ তাহার চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া ঘটনাস্থলে দৌড়িয়া

আসিল এবং ঘোড়ার রাশ সজোরে টানিয়া ধরিয়া বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

ভগিনীদ্বয় ব্যাপার দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিল। ভয়ে তাহাদের মুখে কথা ফোটে নাই। হরিচরণ বালিকাকে তুলিয়া ধরিতে তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইল। বেলা জিজ্ঞাসা করিল, —“বেশী লেগেছে কি?”

হরিচরণ বালিকার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, —“না, বোধ হয় বেশী লাগে নি।”

নরেন্দ্র রাগান্বিত ভাবে হরিচরণকে বলিয়া উঠিল,—“ওহে, ছেলেদের সাবধানে রাখতে পার না?”

এই কথা বলিতে বলিতে কম্পিত হস্তে নরেন্দ্র তাহার ধূলি-ধূসরিত পরিচ্ছদ ঝাড়িতে লাগিল।

হরিচরণ শান্তভাবে উত্তর করিল, —“আপনিই বা কোন্ আপনার ঘোড়াটিকে বশে রাখতে পেরেছেন?”

“কি!”

নরেন্দ্রের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে হরিচরণের দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “ওহে, তুমি ত বড় উদ্ধত দেখছি। এটুকু তোমার মাথায় ঢোকে নি যে, আমি যদি ঘোড়াটাকে সামলাতে না পারতাম তাহ'লে মেয়েটা যে চাপা পড়ত।”

এমন সময় যূথিকা হরিচরণের কাছে গিয়া বালিকাটিকে চাহিয়া লইল এবং তাহাকে কোলে করিয়া কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল।

তখন তাহারা দু'জন পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাব ক্রোধান্বিত ও উদ্ধত। কিন্তু হরিচরণ যেন ঘৃণাসূচক

ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। রাগ অপেক্ষা ঘৃণা সহ্য করাই বড কষ্টকর! বেলা একবার নরেন্দ্রের মুখের দিকে, একবার হরিচরণের মুখের দিকে তাকাইতেছে। অবশ্য হরিচরণের সহিতই তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি!

"তুমি কে? তোমার নাম কি?" নরেন্দ্র রাগে গরগর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল।

"তাব সঙ্গে এ ব্যাপারের কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারছি না।" হরিচরণ একটু কর্কশ ভাবে এই কথাগুলি বলিল। "আপনি কে?"

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল,—"আমি মির্জ্জাপুর নিবাসী নরেন্দ্রনাথ বাবু"—এই বলিয়া সে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিল। মনে করিল এ উত্তরে লোকটা একেবারে চুপ হইয়া যাইবে। কিন্তু হরিচরণ তাহাতে ভীত না হইয়া নরেন্দ্রেরই দোষ দেখাইয়া প্রত্যুত্তর করিল। নরেন্দ্র কি উত্তর দিবে, ঠিক করিতে পারিল না। তখন বেলার দিকে তাকাইয়া বলিল,— "আপনি বোধ হয় ভয় পান নি?"

"না—মেয়েটির যে কোন আঘাত লাগে নি, তাই ভাল। ঐ লোকটি সময়ে এসে উপস্থিত না হলে, আপনি তাকে চাপা দিয়েছিলেন আর কি!"

"যাক্, বিপদ যে কেটে গেছে, তার জন্য আমি বড়ই সন্তুষ্ট।" এই বলিয়া নরেন্দ্র তাহার পকেটে হাত দিয়া একটি টাকা বাহির করিল এবং হরিচরণের দিকে ছুড়িয়া দিয়া ঘৃণাসূচক ভাবে বলিল, —"এই নাও, যাও।

একবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে মেয়েটাকে দেখাও গে। আর ভবিষ্যতে লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শিখো।”

হরিচরণ টাকাটি লইয়া হঠাৎ নরেন্দ্রের শরীর লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। সেটি নরেন্দ্রের দাড়িতে আসিয়া লাগিল। নরেন্দ্র রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ঘোড়ার চাবুক লইয়া হরিচরণের দিকে দৌড়িয়া গেল এবং তাহাকে মারিবার উদ্দেশ্যে চাবুক তুলিল।

হরিচরণ তাহার হাত ধরিয়া চাবুকটি কাড়িয়া লইল; পরে সেটি এরূপ ভাবে ঊর্দ্ধে তুলিল যেন আক্রমণকারীকে প্রহার করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সংযত হইয়া চাবুকটি দূরে নিক্ষেপ করিল। রাগে তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখ জ্বলিতেছে। দু'জনেই নীরব। বেলা স্তম্ভিত হইয়া হরিচরণের ক্রোধবিকৃত মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। এ দৃশ্য বড়ই ভয়ঙ্কর!

হরিচরণ কাহারও অন্যায় আদৌ সহ্য করিতে পারিত না। তাহার মেজাজ স্বভাবতই একটু গরম। ইহার জন্যই তাহার পিতার সহিত তাহার কলহ হইয়াছিল। নরেন্দ্রের এই অভদ্র ব্যবহারে তাহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে একটু শান্ত হইলেও, বেলার প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, পাছে দু'জনের কলহ হাতাহাতিতে পরিণত হয়। আর সে মারামারির ফলও নরেন্দ্রের পক্ষে যে বড় সুবিধাজনক হইবে না তাহাও সে বেশ জানিত;—লোলজিহ্বা অগ্নির মুখে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় নরেন্দ্রের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও থাকিবে না।

দেখিতে দেখিতে হরিচরণ বেশ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। নরেন্দ্র

তখন নিজের অবস্থা সম্যক্ জ্ঞাত হইল ; বেলার দিকে তাকাইয়া বলিল, —"আপনার সম্মুখে এরূপ একটা দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।"

বেলা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না, তাতে কিছু এসে যায় না। তবে আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে চলে যান ; এখানে অপেক্ষা করে কোন ফল হবে না। অনুগ্রহ করে যান।"

নরেন্দ্র হস্ত-সঞ্চালন করিয়া যেন স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য বলিল,—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি চল্লাম ; আপনি ঠিকই বলেছেন, এ প্রকার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার উচিত নয়।"

হরিচরণের দিকে না তাকাইয়া নরেন্দ্র অশ্বারোহণ করিল এবং রাস্তার উপর দিয়া চলিয়া গেল। হরিচরণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আহত বালিকাটির কথা মনে পড়িতেই সে একটু লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইল। বেলাও তাহার পিছু পিছু চলিল।

কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিল ইন্দু যূথিকার কোলে শুইয়া আছে। তাহার কান্না থামিয়া গিয়াছে। সেবাপরায়ণা যূথিকাকে দেখিয়া হরিচরণের মনে হইল তাহার মুখমণ্ডলে এরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সে পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। তাহাকে তখন দয়া ও কোমলতার জীবন্ত প্রতি-মূর্ত্তি বলিয়া তাহার বোধ হইল।

যূথিকা হরিচরণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"না, কোন ভয় নেই।

আঘাত বেশী লাগে নি। ভয়ে এতক্ষণ অমন করে চীৎকার করছিল। ওর মা এখন বাড়ী নেই। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করি।"

হরিচরণ ইত্যবসরে চা প্রস্তুত করিয়া ভগিনীদ্বয়কে পাত্রে ঢালিয়া দিল। পরে নিজে এক পেয়ালা লইয়া পান করিতে বসিল। তাহার মন গভীর চিন্তামগ্ন। সে ভাবিতে লাগিল,—"তাহলে ইনিই হচ্ছেন আমার খুড়তুতো ভাই নরেন্দ্রনাথ! ভবিষ্যতে ইনিই বাবার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হতেন।" দুই ভায়ের এরূপ মিলন বড়ই অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর। প্রথম দৃষ্টিতেই নরেন্দ্রের চেহারা তাহার ভাল লাগে নাই। আবার তাহার সহিত কলহের পর তাহার উপর ঘৃণার মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্র রমণীদ্বয়ের সহিত বেশ স্বচ্ছন্দে মিলিয়া মিশিয়া বেড়াইতেছে; আর সে তাহাদের নৌকায় চড়াইয়া মাঝির বেশ ধারণ করিয়াছে—এ কি ভাগ্যবিপর্য্যয়!

এমন সময় গৃহকর্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইতেই হরিচরণ কুটীর হইতে বাহিরে আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যত শীঘ্র সম্ভব, সে এই স্থান ত্যাগ করিবে। আগামী কল্য সে ভগিনীদ্বয়কে নৌকায় চড়াইয়া বেড়াইয়া আনিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সুতরাং তার পরদিনই প্রস্থান করিবে। এ মানসিক উদ্বেগ আর সহ্য হয় না। এ অঞ্চলই একেবারে ত্যাগ করিয়া সে সিংহলে গিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে হরিচরণ তীরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

নদীতীরে যাইবার পথে একটি বড় ফিটন গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। হরিচরণকে দেখিতে পাইয়া গাড়ীর সহিস বলিল,—"ঐ তীরের উপর

যে ভদ্র লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে এই কাগজখানি দিয়ে আসবে? এখানি বিশেষ দরকারী; উঁহাদের এখনই দরকারে লাগবে।"

হরিচরণ তাকাইয়া দেখিল, তীরের উপর একটি ভদ্রলোককে মাঝখানে রাখিয়া অনেক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হরিচরণ সহিসকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এঁরা কারা? কি জন্যেই বা এসেছেন?"

"তা বুঝি জান না? ঐ যে মাঝখানের যুবককে দেখতে পাচ্ছ, উনি হচ্ছেন দত্ত সাহেব, আর ওঁর পাশেই ইঞ্জিনীয়ার দাড়িয়ে রয়েছেন। নদীতীরে একটি বাড়ী তৈরী করবার ইচ্ছা হয়েছে। তা কাগজখানা দয়া করে দিয়ে আসবে?"

হরিচরণ ব্যারিষ্টার অশোক দত্তের নাম মাত্র পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। উঁহাদের জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তি মির্জ্জাপুরের লাগালাগি। হরিচরণ নিকটে আর কোনও লোককে না দেখিতে পাইয়া নিজেই যাইতে স্বীকৃত হইল।

হরিচরণ কাগজখানি ইঞ্জিনীয়ারের হাতে গিয়া দিল। তিনি আবার অশোক বাবুর নিকটে গিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমাদের এই বাড়ীর নক্সা; এর চেয়ে আরও ভাল করে তৈরী করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে, কোথায় বাড়ী তৈরী করা হবে। তীরটা একবার ঘুরে না দেখলে, স্থানটা ঠিক করা যাবে না।"

অশোক বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"তার আর কি? আমি এখনই নৌকায় চড়ে তীরটা ঘুরে আসছি।" পরে সম্মুখে তাকাইয়া হরিচরণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই যে! তোমার নৌকা কোথায়, চল ত যাই।" এরূপভাবে তিনি এ বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন যে হরিচরণ কিছুতেই তাঁহার

কথায় অস্বীকার করিতে পারিল না। সে পথ দেখাইয়া তাঁহাকে তাহার নৌকায় লইয়া গেল।

হরিচরণ জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল। অশোক বাবু তীরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; পরে হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, আমি এখানে একটা বাড়ী তৈরী করব। তা, তুমি ত এ স্থানের লোক, বলতে পার কোন জায়গাতে বাড়ী তৈরী করলে সুবিধা হবে?"

হরিচরণ এ সম্বন্ধে এত কথা বলিল, গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে এত পরামর্শ দিল যে, অশোক বাবু তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

হরিচরণ যে নৌকার মাঝি তাহা ভুলিয়া গিয়া সমবয়স্ক বন্ধুর ন্যায় তিনি তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার নিকট হইতে দিয়াশালাই চাহিয়া লইয়া তিনি ধূমপান করিলেন। তাঁহার শিষ্ট ব্যবহারে হরিচরণও বড়ই মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল।

গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত একটি স্থান ঠিক করিয়া অশোক বাবু নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। ফিরিবার মুখেও সারাপথ তিনি হরিচরণের সহিত গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে তীরে নামিয়া হরিচরণকে ধরিয়া বসিলেন,—"এ কাজে তোমাকে আমার সাহায্য করতেই হবে। এ সব সম্বন্ধে তুমি যত জান, এমন আর কেউ জানে বলে বোধ হয় না। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। পূজোর বন্ধে আমি দেশে এসেছি। ছুটির মধ্যে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলতে হবে। তোমার উপর সব ভার দিয়ে আমি চলে যাবো। আর মাহিনার সম্বন্ধে তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি যা চাবে, তাই দিব।"

হরিচরণ পূর্ব্ব হইতেই যুবকের সদয় ব্যবহার ও সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল; ইতিমধ্যে অশোক বাবু মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

(৯)

হরিচরণের মনে হইতে লাগিল যেন অদৃষ্টদেবী পরিহাসচ্ছলে তাহাকে এ স্থানের প্রতি আরও আকৃষ্ট করিতেছেন এবং তাহার এ স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্পকে বিফল করিয়া দিয়া অন্তরালে বসিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহার জন্য সে যতটা দুঃখিত হইয়াছে বলিয়া মনে ভাবিয়াছিল ততটা দুঃখ সে যথার্থই অনুভব করে নাই। আরও জমীদার অশোক বাবুর প্রতি তাহার অনুরাগের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছিল।

পরদিন হরিচরণ নদীতীরে বসিয়া তাহার নৌকা ঠিক করিতেছে, এমন সময় অশোক বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিচরণকে দেখিয়া বলিলেন, "যাহোক্ তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল; চল খানিকটা ঘুরে আসি।"

"এখন ত আমার যাবার জো নেই; আগে থেকেই আমি আর এক জনদের কথা দিয়েছি।"

এমন সময় ভগিনীদ্বয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অশোক বাবু হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই দুইটি স্ত্রীলোকের কথাই সে বলিতেছিল। তখন তিনি তাহাদের নাম ধামও জানিয়া লইলেন। তিনি পূর্ব্বেই ইঁহাদের কথা শুনিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আলাপ

পরিচয় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য—গৃহ-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প—সবই এক নিঃশ্বাসে তাহাদের নিকট বলিলেন। বেলার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া তিনি একটু মুগ্ধও হইয়াছিলেন।

"আপনারা বোধ হয় এঁর নৌকায় চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। আমারও একটু দরকার আছে। তা আমি অন্য নৌকা খুঁজে নিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি আশেপাশে একবার তাকাইলেন। কিন্তু হরিচরণের নৌকা ব্যতীত ঘাটে আর দ্বিতীয় নৌকা ছিল না। তাহাদের সহিত একসঙ্গে যাইতে অশোক বাবুর ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া যূথিকা তাঁহাকে বলিলেন,—"চলুন না, আমাদের সঙ্গেই চলুন; আমাদের বিশেষ কোন জায়গায় যাবার দরকার নেই।"

অশোক বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের সহিত নৌকায় উঠিলেন। হরিচরণও নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহারা তিনজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। যূথিকা বেশী কথা কহে নাই। বেলা ও অশোক বাবু দুজনে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিল। অশোক বাবুর সরলতা ও অমায়িকতা লইয়া বেলা মধ্যে মধ্যে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না।

কিছুদূর গিয়া অশোক বাবু তীরে নামিতে উদ্যত হইলেন এবং বেলাকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা দুজনে তীরে নামিল। হরিচরণ ও যূথিকা নৌকায় বসিয়া রহিল। যূথিকা তাহাদের সহিত যাইতে চাহিল না। সে হরিচরণের সহিত কথা কহিতে লাগিল,—"কাল মেয়েটি বড় রক্ষা পেয়েছে; তুমি সময়ে না এলে তার খুব আঘাত লাগত। তোমায় লাগে নি ত?"

"না আমায় আদৌ লাগে নি। তা, আপনি যখন ও কথা তুল্লেন,

তখন একটা কথা বলি। কাল আপনাদের সম্মুখে আমার অমন রাগ প্রকাশ করা ভাল হয় নি। সে জন্যে কিছু মনে করবেন না। আমার রাগটা স্বভাবতঃই একটু বেশী।" এই কথা বলিয়াই হরিচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। পুরাতন দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। এই ক্রোধেরই বশীভূত হইয়া পিতাপুত্রের মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল!

এমন সময় অশোক বাবু ও বেলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নৌকায় চড়িলে হরিচরণ নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। ভগিনীদ্বয় তীরে নামিয়া একটু অগ্রসর হইল। অশোক বাবু হরিচরণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"কাল যা বলেছিলাম, মনে আছে ত? আজ আবার এঁদের নিকট তোমার গুণের পরিচয় পেয়ে তোমায় কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। আমার কাজ তোমাকে করতেই হবে, আর কোথাও যেতে পারবে না।"

হরিচরণের সম্মতি বা প্রত্যাখ্যান কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। দুচার পদ অগ্রসর হইয়াই আবার হরিচরণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তুমি কেবল আমারই কাজ করবে বটে, তবে এই স্ত্রীলোক দু'টি তোমাকে যখন যা করতে বলবেন, তাতে অস্বীকার করবে না।" এই কথা বলিয়াই তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে তাহাদের সঙ্গে গিয়া জুটিলেন।

হরিচরণ হাঁ, না, কিছুই বলিল না। তাহার মানসিক অবস্থা এরূপ নহে যে সে এই সব কথার যোগ্য উত্তর দেয়। সে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে নদী-তীরস্থ উপলখণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল।

গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হরিচরণ খুব মনো-

যোগের সহিত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। অশোক বাবুর সরলতায় ও সদয় ব্যবহারে সে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কার্য্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। বাড়ীর মালমসলা সংগ্রহ করিতে, অধীন লোকদের কার্য্য সমগ্র পরিদর্শন করিতে তাহার দিনের বেলাটা প্রায় সবই কাটিয়া যাইত; সন্ধ্যার সময় সে অনেকটা বিশ্রাম পাইত। তাহার কার্য্যে অশোক বাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তরুণবয়স্ক অশোক বাবুর কার্য্যে উৎসাহ ছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধির তাদৃশ দৌড় না থাকায় কাজকর্ম্ম তিনি তেমন ভাল বুঝিতেন না। তিনি হরিচরণের উপরই সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় বেলার সহিত গল্প গুজবে ও আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন।

একদিন হরিচরণ সন্ধ্যাবেলা দিনের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নদীতীরে বসিয়া আছে, এমন সময় অশোক বাবু ও ভগিনীদ্বয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশোক বাবু ও বেলা নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাপ্রকার তর্কবিতর্কে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে লাগিলেন। যূথিকা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নৌকায় বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সান্ধ্য সমীরণ মৃদুমন্দ বহিতেছিল। হরিচরণ নৌকায় পাল তুলিয়া দিতে যূথিকা নৌকায় গিয়া উঠিল। সে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

কিছুদূর গিয়া হরিচরণ বলিল—"স্থানটি বেশ সুন্দর!"

যূথিকা মৃদুস্বরে বলিল, "তা বটে, কিন্তু মির্জ্জাপুর সহর এর চেয়ে বেশী সুন্দর।"

"নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই!"

"তুমি কি সেখানে কখনও গেছ?"

"হাঁ, গেছি। আপনারা সেখানে বোধ হয় অনেক দিন ধরেই আছেন?"

"হাঁ, প্রায় তিনশ বছর। তুমি যদি এবার ওদিকে কখনও যাও ত আমাদের বাড়ীতে একবার যেও। আমরা সেখানে যখন থাকব, সেই সময় একদিন যেও।"

আকাশ হঠাৎ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নদীতে ঝড় উঠিল। উচ্চ তরঙ্গ নদী-বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল। নৌকা খানিও তরঙ্গের সহিত উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

"আপনি কি ভয় পেয়েছেন?" হরিচরণ মৃদুস্বরে যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল।

"না, ভয় পাই নি। কোন বিপদের আশঙ্কা আছে না কি?"

হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। ঝড় ও বৃষ্টি একত্র মিলিয়া এক তুমুলকাণ্ড উপস্থিত করিল। সম্মুখের কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাহাদের গায়ে নদীর লবণাক্ত জলকণা ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রকৃতিদেবীর এই ক্রীড়া দেখিয়া যূথিকা ভীত হইল না, আনন্দে তাহার অন্তঃকরণ নাচিতে লাগিল।

হরিচরণ তখন বিমর্ষভাবে বলিল,—"আকাশের অবস্থা দেখে আমার পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল, ঝড় বৃষ্টি হবে। আপনাকে এমন সময় নৌকায় না চড়ালেই ভাল হত। আপনি একবারে ভিজে গেছেন, দেখছি।"

"না, আমি বেশী ভিজি নি, কিন্তু তুমি যে একেবারে জলে নেয়ে গেছ দেখছি। আশ্চর্য্যের কথা, এত বিপদেও আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। এ রকম আনন্দ আমি অনেক দিন অনুভব করি নি।"

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌকাখানিকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে নাড়া দিল। যূথিকা নৌকার উপর মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। হরিচরণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া তুলিল।

সে বড়ই ভয় পাইয়াছিল। তথাপি এক হাতে মূৰ্চ্ছিতা যূথিকাকে ধরিয়া অপর হাতে দাঁড় টানিতে লাগিল। যূথিকার চক্ষুৰ্দ্বয় নিমীলিত, ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর পৃথক; দেখিলে মনে হয় যেন জীবাত্মা বহুক্ষণ পূৰ্ব্বেই দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হরিচরণেরও সংজ্ঞা লোপ পাইবার মত হইল। সে অনেক কষ্টে সাহস সংগ্রহ করিয়া যূথিকাকে নাড়া দিয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে লাগিল,—"যূথিকা! যূথিকা!"

যূথিকার দেহ যেন একটু নড়িয়া উঠিল। হরিচরণ সাহসে ভর করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল,—"যূথিকা, তোমার কোনও ভয় নেই। বিপদের আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে। এই যে আমি তোমার পাশে বসে রয়েছি, অমিয়কুমার—হরিচরণ—আঘাতটা কি বড় বেশী লেগেছে?"

সে যূথিকাকে নিজের বক্ষের দিকে টানিয়া লইল এবং তাহার চৈতন্য সঞ্চারের জন্য নানাপ্রকার উৎসাহবৰ্দ্ধক কথা বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যূথিকা চক্ষু মেলিল এবং হরিচরণের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কি হয়েছে? আমাদের নৌকা কি ডুবে গেছে?"

"না, না, আমরা নিরাপদে আছি। কেবল তরঙ্গের আঘাতে আপনি মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। বড় লেগেছে কি?"

যূথিকা সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে হরিচরণের বক্ষ হইতে সরিয়া

গেল। হরিচরণ উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও যূথিকা দেখিতে পাইল তাহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছে।

আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। বৃষ্টি থামিয়া গেল। ঝড় মৃদুমন্দ বাতাসে পরিণত হইল। হরিচরণ নৌকার পাল তুলিয়া দাড়ি টানিতে লাগিল। যূথিকা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। নচেৎ হরিচরণ দেখিতে পাইত যে, বিস্ময় সন্দেহ ও উদ্বেগ এই ত্রিবিধ ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সে তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রহিয়াছে!

তাহারা নির্ব্বিঘ্নে তীরে আসিয়া পৌছিল। বেলা ও অশোক বাবু তাহাদের জন্যই শঙ্কিত চিত্তে তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যূথিকাকে লইয়া তাঁহারা বাড়ী চলিয়া গেলেন। বেলা যাইবার সময় হরিচরণকে দু'চার কথা বলিতে ছাড়িল না।

বাড়ীতে গিয়া যূথিকাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন কেমন আছ দিদি?"

"ভালই। তবে এখনও বড় ভয় পাচ্ছে।" তাঁহার মনের মধ্যে তখন প্রবল ঝড় বহিয়া যাইতেছিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে উচ্চারিত হরিচরণের সেই আত্মপরিচয়, সেই রহস্যময় নামোচ্চারণ তখনও তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল।

(১০)

হরিচরণ যূথিকাকে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে যূথিকার দেহ বক্ষে ধারণ করিবার সময় সে ইহা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের বক্ষের ভিতর তাহার বক্ষের স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। তখন বাহিরের ঝড় অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ঝড় তাহার হৃদয়ের ভিতর বহিয়া গিয়াছিল।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া যূথিকাকে দেখা অবধি সে তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাল্যকালে যখন তাহারা দু'জন একত্র খেলা করিত, তখন হইতেই তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভালবাসা ক্রমেই একটু একটু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সে বুঝিতে পারিল কেন যূথিকাকে দেখিলে তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পাশে থাকিলে সে এত সুখী হয়, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে তাহাকে ভালবাসিয়াছে!

এখন কি করা উচিত? এই প্রশ্ন সে বহুবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। এরূপ গোলমালে সে আর কখনও পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। যূথিকার পরিবর্তে সে যদি কোন সাধারণ দরিদ্র স্ত্রীলোককে ভালবাসিত, তাহা হইলে অনায়াসে তাহার নিকট হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া দূর সিংহল দ্বীপে লইয়া গিয়া সেখানে সুখে ঘরকন্না করিতে পারিত!

কিন্তু তাহার ভালবাসার পাত্রী যে যূথিকা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব না করিলে সেই তাহার পিতার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হইবে। এই জন্যই ত তাহার মনে এত দুঃখ! যূথিকার নিকটে গিয়া এখন আত্মপরিচয় দিলে, সে নিশ্চয় ইহা স্থির করিবে যে, সম্পত্তির লোভে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সে এত কাণ্ড করিতেছে।

হরিচরণ চুরুটে আগুন ধরাইয়া তীরের উপর পায়চারি করিতে লাগিল এবং এই সব মনে মনে ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল, ঝড়ের রাত্রে সে যে উত্তেজিত হইয়া যূথিকার নিকট তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিল, যূথিকা সে কথা শুনিলে, তাহার মুখে সন্দেহের চিহ্ন নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিত। সে বুঝিল না যে, স্ত্রীলোক অতি অল্প আয়াসেই মনের ভাব অপরের নিকট হইতে আশ্চর্য্যরূপে গোপন করিতে পারে, ইহা তাহাদের জাতির স্বভাব। স্ত্রীলোক যে অতি দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার সময়ও হাসিতে পারে, তাহা সে মানসিক উত্তেজনার বশে ভুলিয়া গিয়াছিল।

এখন কি করা যায়? ইহাই তাহার চিন্তা। পলাইয়া যাওয়া ছাড়া আর কি পথ আছে? কিন্তু পলাইয়া যাওয়া বড়ই হেয় বলিয়া সে মনে করিল। অশোক বাবুর অনুরোধে গৃহ-নির্ম্মাণের ভার সে নিজস্কন্ধে লইয়াছে। অশোক বাবু তাহার সহিত যথাসম্ভব সদয় ব্যবহার করিতেছেন। তাহার কার্য্য-কুশলতার উপর তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পলায়ন করা অমানুষের কাজ। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, না, সে পলাইবে না। তবে ভবিষ্যতে জিহ্বাকে সংযত রাখিয়া অতি সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। পরে গৃহ নির্ম্মিত

হইয়া গেলে, সে সিংহলে ফিরিয়া গিয়া চাষবাস করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবে।

হরিচরণ মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া বাড়ী গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। বিছানার উপর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ও নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই ছবি ভাসিয়া উঠিল.—যেন নৌকার উপর যূথিকার মূর্চ্ছিত দেহ সে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে!

যূথিকাও সারারাত্রি বিছানায় জাগিয়া কাটাইয়াছে। মানসিক উত্তেজনায় ও উদ্বেগে সে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিয়াছে। হরিচরণের সেই কথাগুলি কেবলই তাহার কানের ভিতর আসিয়া বাজিয়াছে। হরিচরণই কি অমিয়কুমার, এতদিন ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া আসিতেছে? অনেক চেষ্টা করিয়াও এ সব চিন্তা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিল না।

হরিচরণের বেশ কি মাঝির ছদ্মবেশ মাত্র? সে কত বলবান ও সাহসী! সেই ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময়ও সে একটুও ভীত হয় নাই। দেখিতে কেমন সুন্দর, আচার ব্যবহার কত নম্র। কিরূপ সাহসের সহিত সে তাহাকে সেই সর্ব্বগ্রাসী বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। সে মনের মধ্যে কেবল সেই সব প্রসঙ্গেরই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। অনেক কষ্টে যূথিকার একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু তন্দ্রাবেশেও সে কেবল হরিচরণের বিষয়ই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

পরদিন যূথিকার শরীর অসুস্থ থাকায় সে বাড়ীর বাহির হয় নাই। বেলা হরিচরণের দেখা পাইয়া যূথিকার অসুস্থতার সংবাদ তাহাকে দিল

এবং তাহার দুঃসাহসের জন্য পুনর্ব্বার তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিতেও ছাড়িল না। যূথিকার অসুখের কথা শুনিয়া হরিচরণ মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইল এবং তাহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

হরিচরণের সে আশা শীঘ্রই পূর্ণ হইল। পরদিন অপরাহ্ণে হরিচরণ নদীতীরে বসিয়া আছে, এমন সময় যূথিকা বেলা ও অশোক বাবু সমভি-ব্যাহারে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও চিন্তাযুক্ত। হরিচরণের প্রতি সে স্থির সরল দৃষ্টিতে তাকাইল। সে চাহনি লক্ষ্য করিয়া হরিচরণ স্থির করিল যে যূথিকা তাহার আত্মপরিচয় নিশ্চয়ই টের পায় নাই। অশোক বাবু তাহাকে জানাইলেন, যূথিকা আজ একটু ভাল আছে। সেখানে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল। হরিচরণও স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হরিচরণ উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগিয়া গেল। সমস্ত দিন অধীন লোক-জন লইয়া কার্য্যে সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, স্বয়ং অশোক বাবু আসিলেও তাঁহার সহিত কথা কহিবার বেশী অবসর পাইত না। ভগিনীদ্বয় প্রত্যহই নদীতীরে বেড়াইতে আসিত। কিন্তু হরিচরণ ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিত। বেলা নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিলে, হরিচরণ নিজে কাজের অছিলা করিয়া অপর মাঝির নৌকা ঠিক করিয়া দিত এবং নৌকা ছাড়িয়া দিলে সে একদৃষ্টে তাহাদের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিত।

হরিচরণের প্রকৃতি দিন দিন বড়ই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। এদিকে যূথিকা ক্রমেই তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইল। স্থানীয় জল

বায়ু বা বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের গুণে তাহার যে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। সে বুঝিতে পারিত যে হরিচরণ নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসে এবং সে রাত্রে অকস্মাৎ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলাতে ইচ্ছা করিয়াই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে; দূর হইতে তাহার কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া যূথিকা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইত। এ ব্যাপার তাহার জীবন-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিলেও তাহার মনের অশান্তি অনেকটা দূর করিয়াছিল।

ভগিনীদ্বয়ের মির্জ্জাপুর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাইবার দিন সকালে রাস্তায় বেলার সহিত হরিচরণের দেখা হইল। বেলা বলিয়া উঠিল,—"হরিচরণ! আমরা আজ দেশে যাচ্ছি। দিদি সেদিন এখানে একখানা বই ফেলে গেছে, তাই নিতে এলাম।"

"হাঁ, বইখানা আমার কাছেই আছে। তিনি ফেলে গেছলেন, আমি কুড়িয়ে বাড়ী নিয়ে যাই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ঘর থেকে এনে দিচ্ছি।"

"তবে তুমিই বইখানা তাকে দিয়ে এস। আমি একটু ব্যস্ত আছি। বাজারে যাচ্ছি, অনেক জিনিষপত্র কিনতে হবে।"

হরিচরণ প্রথম ভাবিল অন্য কাহাকেও দিয়া বইখানি পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া, বোধ হয় যূথিকাকে একবার দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া নিজেই পুস্তক লইয়া চলিল। যূথিকার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যূথিকা যাত্রার আয়োজন করিবার জন্য জিনিষপত্র বাঁধিতেছে।

"এই আপনার বইখানা এনেছি।"

"হাঁ, দেখ, বইখানা ভুলে ফেলে যাচ্ছিলাম। তা, আমরা আজ চলেছি। তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছ, তার জন্য তোমার নিকট আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ। যতদিন না গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ হয় ততদিন বোধ হয় তুমি এখানেই থাকবে?"

"হাঁ, বোধ হয় ততদিন আমাকে এখানেই থাকতে হবে। জিনিষপত্র গুলো আপনার একলা গুছুতে কষ্ট হচ্ছে। দিন, আমিও কতক গুছিয়ে দিই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হরিচরণ কাজে লাগিয়া গেল। দড়ি, ছুরি সে সঙ্গেই আনিয়াছিল। খুব উৎসাহের সহিত জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল।

কাজ শেষ হইয়া গেল। যূথিকা দেখিল তাহার একখানি রুমাল লইয়া হরিচরণ নাড়াচাড়া করিতেছে। যূথিকা এরূপ ভাব দেখাইল যেন সে উহা লক্ষ্য করে নাই এবং হরিচরণ যে উহা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহার নিকট রাখিতে চাহিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিল। সে রুমালখানি লইয়া দেখিয়া বলিল,—"এটা কি হবে? এ যে একখানা পুরান রুমাল, এ আর সঙ্গে নিয়ে কাজ নেই।" এই বলিয়া জানালা দিয়া সম্মুখস্থ উদ্যানে উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"তাহ'লে আমি এখন যেতে পারি। আপনার আর কিছু করতে হবে কি?"

"না, কিছু মনে করো না, এখানে শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হলো!"

"ও কথা বলবেন না! আপনারা এত শীঘ্র যাচ্ছেন বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত।"

হরিচরণ ঘরের বাহিরে যাইবামাত্র যূথিকা—"হরিচরণ" বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিল।

সে পুনর্ব্বার ঘরের ভিতর ঢুকিল। যূথিকা বলিল, —"দেখ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তাই আবার ডাকলাম। যদি আমাদের ঘর বাড়ী দেখতে কখনও মির্জ্জাপুরে যাও, তাহ'লে আমাদের খবর দিয়ে যেও, বুঝলে?"

"আচ্ছা।" হরিচরণ আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সে বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিল। নীচে নামিয়া আসিয়া বাগান হইতে রুমালটি কুড়াইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। যূথিকাও জানালা হইতে তাহাকে উহা কুড়াইয়া লইতে দেখিয়া মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল। লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষে ও ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। সে একদৃষ্টে গমনশীল হরিচরণের দিকে তাকাইয়া রহিল। হরিচরণের মাথা বুকের উপর নুইয়া পড়িয়াছে। চরণের গতি বড়ই শিথিল। এমন সময় যূথিকা দেখিল একখানা গাড়ী তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

হরিচরণ গাড়ীর ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিল, নরেন্দ্র বসিয়া রহিয়াছে। যূথিকাকে জানালায় দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নরেন্দ্র অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আপনারা বাড়ী যাচ্ছেন শুনে একবার এলাম, যদি কোন কাজে আপনাদের একটুও সাহায্য করতে পারি।"

হরিচরণের মুখে যেন গভীর কালিমা ব্যাপ্ত হইয়া গেল।

(১১)

ভগিনীদ্বয় গৃহে ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার বাবু যূথিকাকে সুস্থ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালী ফলদায়ক হইয়াছে বলিয়া মনে মনে বড়ই উল্লসিত হইলেন। দুষ্টবুদ্ধি বেলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"হাঁ, ভাগ্যে সেখানে ডাক্তার ছিল না, তাই দিদি এত শীঘ্র সেরে উঠেছে।"

যূথিকা সহাস্য মুখে নিজমনে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মানসিক গতির এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বেলা মধ্যে মধ্যে ভাবিত,—এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ঝড়বৃষ্টির দিন নৌকায় যাহা ঘটিয়াছিল, বেলা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যূথিকা এখন আর নির্জ্জনে থাকিতে চাহে না। সকলের সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তিতে কথাবার্ত্তা কহিয়া বেড়ায়। অধীন লোকজনও তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল।

দু'চার দিন না যাইতে যাইতেই অশোক বাবু তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার খুড়ী যোগমায়াও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। ভগিনীদ্বয়ের সরল ও নম্র ব্যবহার দেখিয়া যোগমায়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ বেলার কথাবার্ত্তায় ও বাক্যালাপে তিনি বড়ই প্রীত হইলেন। অল্পক্ষণের পরিচয়েই তিনি ভগিনীদ্বয়কে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং স্নেহ ও যত্নে তাহাদের মৃত মাতার স্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এ প্রস্তাবে যূথিকার নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তাহার যোগাইল না।

কয়েকদিন পরে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে যূথিকা স্বীয় ভবনে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিল। অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত নরেন্দ্রও তথায় উপস্থিত ছিল। সে সর্ব্বদাই যূথিকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। উপস্থিত সকলেই ভাবিল এ দুইজন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলে পরিণাম বড়ই সুখের হয়। কিন্তু নরেন্দ্রের ব্যবহার বেলার নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। সে পার্শ্বস্থিত অশোক বাবুকে অস্পষ্টস্বরে বলিল,—"দেখছেন নরেন্দ্র বাবুর কেমন মুখে হাসি, কিন্তু উহাঁর অন্তরে বিষ। ওকে দেখলে, আমার চিড়িয়াখানার কুমীরের কথা মনে পড়ে যায়। তারাও কেমন হাসিমুখে রোদ পোহায়, কিন্তু সম্মুখে খাদ্য দেখলেই কামড়াবার জন্য দশনপংক্তি বিকাশ করে।"

গভীর রাত্রে অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্ব স্ব বাড়ী চলিয়া গেলে নরেন্দ্রও বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজের কারখানার দিকে চলিল। তাহার মুখ বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত। যে বাড়ীতে আজ সে নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই বিষম ভুলে আসল উইলখানি পুড়াইয়া না ফেলিলেই, আজ সে-ই সে বাড়ীর গৃহস্বামী হইতে পারিত। এই দুর্ব্বিষহ চিন্তা তাহার অন্তঃকরণ পুড়াইয়া ফেলিতেছিল।

যদি ঐ ভুলটা না হইত? তবে কি ও ভ্রম সংশোধন করিবার---নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধার করিবার আর কোনও উপায়ই নাই?'

উকিলের বাড়ী হইতে অমিয়কুমারের যে ত্যাগপত্রখানি নরেন্দ্র কুড়াইয়া আনিয়াছিল, তাহা তাহার আলমারির ভিতর অতি সযত্নে রক্ষিত ছিল। নির্দ্দিষ্ট দিন অতিবাহিত না হইলে, ইহা কোন কাজেই আসিবে না। ইতিমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি অমিয়কুমারও বাড়ী ফিরিয়া আসিতে

পাবে, তখন সম্পত্তি উদ্ধারের সকল আশাই তাহার নিষ্ফল হইবে। কিম্বা অমিয়কুমারের ত্যাগপত্র অনুসারে কার্য্য হইলেও, যূথিকাই প্রথম সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। তাহার লাভ কি? তবে এক উপায় আছে, যূথিকাকে বিবাহ করা। এ কথা বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু যূথিকার এ বিষয়ে সম্মতি লাভ করা বড় সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ বেলার ব্যবহার মনে পড়িলেই নরেন্দ্রের মুখ কাল হইয়া উঠে। সে বুঝিত যে, বেলা তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে।

কোন উপায়ই সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। আফিস-ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া কাগজপত্র নাড়িতে লাগিল। এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা মারিল। এত রাত্রে কাহার কি দরকার ভাবিয়া সে একটু রাগান্বিত হইল। পরে দরজা খুলিয়া দেখিল তাহার প্রধান কর্ম্মচারী হারাধন।

"এত রাত্রে কি দরকার?"

"আজ্ঞে একটা বিশেষ দরকার, তাই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি। আমাদের কারবারের মুনিয়া মারা গেছে। সকলের ধারণা যে সে যক্ষ্মারোগে মরেছে। কিন্তু বোধ হয়, তা নয়। আমি আজ তার জিনিস-পত্রের মধ্যে এই শিশিটা পেয়েছি। আমার সন্দেহ হয়, এর মধ্যে কোন বিষাক্ত দ্রব্য আছে; তাই খেয়ে সে মরেছে।"

নরেন্দ্র শিশিটা হাতে লইয়া দেখিয়া বলিল,—"না, না; এ ত দেখছি বাতের ওষুধ। থাক্ এ কথা যেন আর কারও কাছে বলো না। তাহ'লে বেচারীর পরিবারবর্গকে অনর্থক কষ্ট ভোগ ও অর্থ ব্যয় করতে হবে।"

হারাধন প্রভুকে অভিবাদন করিয়া বিদায়গ্রহণ করিল। নরেন্দ্র শিশিটা

হাতে লইয়া আলোর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, "বিষ খেয়ে মরা আজকাল বড়ই প্রচলিত হয়েছে দেখছি।"

শিশির ভিতরের তরল পদার্থটুকু সে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কি উপাদানে ইহা প্রস্তুত, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিশিটি আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিল।

(১২)

হরিচরণ বলিয়াছিল একদিন সুবিধামত মির্জ্জাপুরে বেড়াইতে আসিবে। যূথিকা বাড়ী আসা অবধি তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কিন্তু সে আশা তাহার ফলবতী হয় নাই। হরিচরণের অদর্শনে তাহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক সুযোগও জুটিয়া গেল। অশোক বাবু একদিন ভগিনীদ্বয় ও নরেন্দ্রকে তাঁহার বাড়ীতে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অশোক বাবুর বাড়ীতে হরিচরণের সাক্ষাৎ লাভ নিশ্চিত ভাবিয়া যূথিকা বড়ই আনন্দিত হইল। তাহারা যথাসময়ে অশোক বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। যূথিকা সংবাদ লইয়া জানিল হরিচরণ পূর্ব্বেই আসিয়াছে। তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু হরিচরণকে বাড়ীতে না দেখিয়া যূথিকা তাহার সন্ধানে বাহির হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হরিচরণকে এক বাগানে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। সে বড়ই বিমর্ষভাবে বসিয়াছিল।

তাহার নিকটে গিয়া যূথিকা ব্যাকুলভাবে তাহার কুশল প্রশ্ন করিল,— "তোমাকে দেখে ত বেশ সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে দেখছি। তুমি ছুটি নিয়ে দিনকতক অন্য কোথাও ঘুরে এস।"

"না, আমার শরীর বেশ সুস্থই আছে। এ আমার মনের অশান্তি, সহজে দূর হবার নয়। জীবনে যা চাই তা পাবার নয় জেনেও মন তারই জন্য ব্যাকুল হয়।"

"তা'হলে দেখছি, তুমি বড় উচ্চাভিলাষী!"

"উচ্চাভিলাষী? হাঁ ঠিক বলেছেন---বড়ই দুর্ভাগ্য আমার যে, সীমার বাহিরের জিনিষ লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।"

"তা ধৈর্য্য ধরে থাকলে সময়ে পেলেও পেতে পার।"

"না, না, তা হবার নয়। আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজেই সাধন করেছি। আপনাকে সে কথা সব খুলে বলতে পারলে অনেকটা শান্তি পেতাম বটে, কিন্তু সে বিষয় আপনাকে বলবার পর্য্যন্ত আমার অধিকার নেই। সে অধিকারও আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি। তবে যদি কখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে আপনাকে এ কথা বলবো। যত দিনই হোক্, আমি ধৈর্য্য সহকারে সেই শুভমুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো। তখন যা বলবো, আপনি অনুগ্রহ করে শুনবেন কি? না, না, আমাকে ক্ষমা করুন; আপনাকে এরূপ ভাবে যা তা বলা ভদ্রতাসঙ্গত নয়।"

যূথিকা মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"তুমি যা বলবে, আমি আনন্দের সঙ্গে শুনবো। তুমি আমাদের দু'বোনকে যথেষ্ট যত্ন করেছ। তাহলে এখন চল্লাম, দেরী হয়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সে অশোক বাবুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

হরিচরণ তাহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল,—"হাঁ, যতদিন না উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়, ততদিন আমি অপেক্ষা করবো।

তারপর গিয়ে বলবো,—আমিই অমিয়কুমার। বিষয় সম্পত্তি সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি ; এ সব তোমার। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি কি আমাকে বিবাহ করতে সম্মত আছ ?” তাহার বিমর্ষ দূর হইয়া গেল। মুখ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল, ভবিষ্যতের এক মধুরোজ্জ্বল চিত্র তাহার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠিল।

হরিচরণ মনের আনন্দে বেড়াইতে বেড়াইতে অশোক বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে আর বৈঠক্‌খানার ভিতর ঢুকিল না, উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দেখিল ঘরটি আলোকমালায় সজ্জিত ; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবিধ সুচারু বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যূথিকাও তাহাদের মধ্যে মণিমুক্তাবেষ্টিত উজ্জ্বল হীরক-খণ্ডের ন্যায় ঘর আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে এত সুন্দর সে আর কখনও দেখে নাই।

তাহারই বুদ্ধিদোষে সে আজ এই সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় দেখিল নরেন্দ্র অশোক বাবুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যূথিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল। যূথিকা তৎক্ষণাৎ সে ঘর ছাড়িয়া নরেন্দ্রের অনুসরণ করতঃ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

হরিচরণ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। হিংসায় তাহার বুক জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। হায় সে যেরূপ নির্ব্বোধ, তার নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত পুরস্কারই পাইয়াছে। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! সে এতদিন বৃথা উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, আর নরেন্দ্র বুদ্ধিবলে ইতি

পূর্ব্বেই যূথিকার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে। জন্মের মত আজ সে যূথিকাকে হারাইতে বসিয়াছে!

সেখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া প্রায় সারারাত্রি সে গ্রামের আসে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। গাছের গোড়া পায়ে লাগিয়া কতবার হোঁচট খাইল, দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল, সেদিকে তাহার আদৌ হুঁস্ নাই। তাহার মাথা ঘুরিতেছে, পা টলিতেছে। ভোর হয় হয় এমন সময় সে নিজের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাতের নির্ম্মল বায়ু সেবনে তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল, দেহ স্নিগ্ধ হইল। সে তখন মনে মনে এক মতলব স্থির করিল।

তাড়াতাড়ি অশোক বাবুকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিল যে, সে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তাহার ফিরিবার আর কোনও সম্ভাবনা নাই। তারপর নিজের ঘরে ঢুকিয়া সামান্য পোষাক পরিচ্ছদ যাহা কিছু ছিল গুছাইয়া লইয়া বসিয়া দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। পরে চুপি চুপি সকলের অলক্ষিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

* * * * *

এদিকে যূথিকা নরেন্দ্রের পিছু পিছু পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে উঠিয়া আসিল। তাহাকে হঠাৎ এমন নিভৃতে ডাকিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এ যাবৎ নরেন্দ্রের ব্যবহারে তাহার মনে এ ভাব কখনও উদিত হয় নাই যে নরেন্দ্র তাহার প্রণয়প্রার্থী। অবশ্য নরেন্দ্রও কখন সে উচ্চভাব হৃদয়ে পোষণ করে নাই। তাহার উদ্দেশ্য, বিষয় সম্পত্তি হস্তগত করা, যূথিকাকে ভালবাসা নহে।

যূথিকা নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া নরেন্দ্রের বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিল। নরেন্দ্র তাহাকে বলিতে লাগিল,—"বহুদিন যাবৎ আমার আচার ব্যবহার দেখে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়, আমি আপনাকে কত ভালবাসি। এতদিন মুখে যে কথা প্রকাশ ক'রতে পারি নি, আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, সে বিষয় আপনাকে জানাবই জানাব। আপনি আমার স্ত্রী হতে সম্মত আছেন কি? জানি আমার পক্ষে এ দুরাশা মাত্র; আমার দুঃসাহস আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি যদি এই বিশাল ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী না হয়ে সামান্য কৃষকবালাও হতেন, তাহলেও আমি আপনার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করতাম। আমি আপনাকেই চাই, আপনার ধনরত্নের কণামাত্রেরও প্রার্থী নই।"

এ কথা শুনিয়া যূথিকা বিস্মিতবদনে নরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিল না। তাহার মৌনতা সম্মতির পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞানে উৎসাহিত হইয়া নরেন্দ্র আরও আবেগভরে বলিতে লাগিল,—"সামাজিক হিসাবেও আপনি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আমি সামান্য কারবারের মালিক মাত্র. তবে আমার জীবন, হৃদয়ভরা ভালবাসা, সব আপনার চরণতলে উৎসর্গ করতে এসেছি। আপনি কি বলেন? এ দীনের প্রতি কি সদয় হবেন না? আপনার উত্তরের উপর এখন আমার জীবনের সুখ শান্তি সব নির্ভর করছে।"

যূথিকা আর নীরব থাকা উচিত নহে ভাবিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, —"আমি বড়ই দুঃখিত। আমি জানতাম না—আমি আশা করি নি যে—"

"তাহ'লে আমার প্রস্তাবে আপনি অসম্মত হচ্ছেন ?"

"হাঁ ; এ ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই।"

"তবে কি আপনার আশা-ভরসা আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে ? দুদিন পরেও কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে না ?"

"না, তা হতে পারে না। আমি শেষ কথাই বলে দিয়েছি।"

"তবে, একটা অনুরোধ আমার রাখবেন। আমাকে ভালবাসতে না পারেন, বন্ধু বলেও জ্ঞান করবেন। তবে বিদায়—এখন আসি।"

"নিশ্চয়, আমরা আজীবন বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকবো।"

যূথিকা সে ঘর ত্যাগ করিয়া বৈঠক্‌খানা ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছে।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া সে যূথিকার বিষয় ভাবিতে লাগিল,—তাহার মুখ বিমর্ষ, অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিবাহ-প্রস্তাব গ্রাহ্য না হইলে কেহই সুখী হয় না, তদ্ব্যতীত নরেন্দ্রের নৈরাশ্যের ও দুঃখের বিশেষ কারণও ছিল। সে বুঝিল, যূথিকার কথার আর নড়চড় হইবে না। তাহার স্বামিরূপে মির্জ্জাপুরে আধিপত্য করা, তাহার ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। এত চেষ্টার পর সামান্য রমণী শেষে তাহার বাসনা পূরণের পথে কণ্টক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল—ইহা অসহ্য !

নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। তাহার আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হইল না ! জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বিষয় সম্পত্তি তাহার করতলগত হইবার সব আশাই নির্ম্মূল হইয়া গেল। যূথিকা যেরূপ সুস্থ ও সবল, তাহাতে তাহার শীঘ্র মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবে না। এই কারবারের কাজ করিয়া সারাজীবন দুঃখে কষ্টে তাহাকে

কাটাইতে হইবে,জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পীড়িত হইতে হইবে!

(১৩)

পরদিন প্রাতে ভগিনীদ্বয় নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া গতরাত্রের ভোজের বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। যূথিকা কিন্তু নরেন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাবের কথা বেলাকে কিছু বলিল না। সে ভাবিল, একেই ত বেলা নরেন্দ্রকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তাহার উপর এ কথা তাহাকে জানাইলে তাহার ঘৃণার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এমন সময় অশোক বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না। একটা বিশেষ খবর আছে। হরিচরণ হঠাৎ চলে গেছে। তার চিঠি এই মাত্র পেলাম।"

বেলা জিজ্ঞাসা করিল,—"বোধ হয় দু'চার দিন কোথাও বেড়াতে গেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল, একটু সুস্থ হয়ে আসুক।"

"না, তা নয়, সে একেবারে চলে গেছে, এর কারণ কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না। চিঠিতেও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। আমার উপর হঠাৎ এত রাগই বা কেন হবে, কিছু বুঝতে পারলাম না। সকালে কাজে আসে নি। একজন লোক এসে তার চিঠিখানা আমাকে দিয়ে গেল। সে চলে গেল, আমার কাজ কি করে চলবে, তা ত বুঝতে পারছি না।"

যূথিকা অনেক চেষ্টা করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। তাহার কথা বা মুখভঙ্গী কিছুতেই ব্যগ্রতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না।

বেলা যূথিকার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক বাবুকে বলিল,—"তা, আর কি হবে। নতুন লোক দেখুন। হরিচরণ না হলে কি আর কাজ চলবে না! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে বোধ হয়। চলুন, পাখীদের খাবার দেব, দেখবেন।"

তাহারা চলিয়া গেলে যূথিকা আরাম বোধ করিল। হরিচরণ তাহা হইলে আর ফিরিবে না! ইহার অর্থ কি? এর মধ্যে কি এমন গুরুতর ঘটনা ঘটিল? যাহা হউক তাহার চিন্তা ত্যাগ করিয়া সে নিজের কার্য্যে মন দিল। কিন্তু নানা কার্য্যের মধ্যেও হরিচরণের কথাই তাহার মনে কেবল উদিত হইতে লাগিল। কোথায়ই বা সে গেল? আর ফিরিয়া আসিবে না, এ কথাই বা পত্রে লিখিবার উদ্দেশ্য কি? তাহার মন ক্রমেই অশান্ত হইতে লাগিল। সে জোর করিয়া পুনর্ব্বার কাজে মন দিল।

* * * * *

দিন কতক পরে একদিন নরেন্দ্র যূথিকাকে দেখিতে আসিল। যূথিকাও বন্ধুর ন্যায় তাহার আদর অভ্যর্থনা করিল। বেলা বাড়ী ছিল না, অশোক বাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল।

পরস্পর কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভৃত্য চা লইয়া আসিল। নরেন্দ্র উঠিতে উদ্যত হইল, কিন্তু যূথিকার বিশেষ অনুরোধে চা পান করিয়া যাইতে সম্মত হইল। যূথিকা আলমারি হইতে কেক ও বিস্কুট বাহির করিতে উঠিল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বুকপকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিল এবং যূথিকার চায়ের পাত্রের

উপর তাহা মুহূর্ত্তমাত্র ধরিয়া পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া দিল। যূথিকা ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিল না। চা পান করিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পর নরেন্দ্র চলিয়া গেল। যূথিকা মনের আনন্দে পিয়ানো বাজাইতে লাগিল। এমন সময় বেলা প্রফুল্লবদনে হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন বেশ আমোদে দিনটা কাটলো তো?"

"হাঁ বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কেটেছে। খেলাধূলা করেই দিনটা গেছে। একটা সংবাদ—অশোক বাবুর খুড়ী তাঁদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে কিছু দিনের জন্য বেড়াতে যাবেন বলেছেন।"

"অবশ্য তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন!"

"আমাকে একলা নয়, দু'জনকেই যাবার কথা বলেছেন। হয় পত্রে তোমাকে এ কথা শীঘ্র জানাবেন, না হয় নিজে এসেই নিমন্ত্রণ করে যাবেন। বেশ দিনকতক আমোদে কাটান যাবে। আজ আর কেউ এসেছিলো?"

"না, আর কেউ নয়। কেবল নরেন্দ্র বাবু বেড়াতে এসেছিলেন।"

"ভগবানের দয়া, যে আমি বাড়ী ছিলাম না! লোকটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।"

দুই ভগিনীতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব চিন্তায় নিমগ্ন। বেলা কলিকাতা যাইবার স্ফূর্ত্তিতে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিল; হঠাৎ যূথিকার দিকে চাহিতেই দেখিল, সে চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"দিদি, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?"

কোন উত্তর আসিল না। যূথিকা একটুও নড়িল না। বেলা কিছুক্ষণ বিস্মিত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এরূপ সময়ে ঘুমান ত তাহার কখনও অভ্যাস ছিল না। সে নিকটে গিয়া দিদির দেহ ধরিয়া ধীরে ধীরে নাড়া দিল। যূথিকার ঘুম ভাঙ্গিল না। বেলা তখন ভয় পাইয়া তাহার নাম ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল। দু'এক মিনিট পরে তাহার যেন একটু হুঁস হইল। সে চোখ মেলিয়া বেলার মুখের দিকে তাকাইল। বেলা একটু আশ্বস্ত হইল।

"এ কি, এমন সময় এরূপ গভীর নিদ্রা কেন?"

যূথিকা ঈষৎ হাসিল। কিন্তু তাহার মুখ তখনও বিবর্ণ, চোখ দু'টি জড়িত। সে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল।

"তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

"না, না, ঘুম পেয়েছিলো। মাথাটা একটু ব্যথা করছে। শরীরটা বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

"এ দেখছি সব অম্বলের লক্ষণ! চা খাবার সময় খুব কেক খেয়েছিলে তো?"

"না, না, ওসব কিছু নয়। আলোগুলো সব নিভিয়ে দিয়েছ কেন? ঘরটা যে অন্ধকার হয়ে গেছে!"

"কেন, আলো ত সব জ্বলছে! তোমার হলো কি? ডাক্তারকে একবার খবর দেই?"

"কিছু করতে হবে না। ভয় নেই আমি এখনই ভাল হয়ে উঠবো, একগ্লাস জল আনতে বল।"

যূথিকা জলপান করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেলা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে যূথিকা একটু সুস্থ বোধ করিল। কিন্তু তাহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল, মাথাটাও তখন সামান্য ব্যথা করিতেছিল।

(১৪)

হরিচরণ ষ্টেশনে গিয়া হাওড়ার ট্রেনে উঠিল। তাহার মনে কেবল যূথিকার কথাই উদিত হইতে লাগিল। ভালবাসার সহিত ঈর্ষ্যা মিশ্রিত হইলে অতি জ্ঞানী লোকেরও মাথা বিকৃত হইয়া যায়। গত রাত্রে যূথিকার সহিত নরেন্দ্রের কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছে, নরেন্দ্র যূথিকার প্রণয়প্রার্থী। দু'এক বার তাহার মনে হইল মির্জ্জাপুরে ফিরিয়া গিয়া সে আত্মপরিচয় প্রদান করে এবং যূথিকার প্রতি তাহার হৃদয়ের গভীর ভালবাসা জানাইয়া নরেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সে পন্থা অবলম্বন করা বড়ই গর্হিত বলিয়া সে মনে করিল।

হরিচরণ গাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িয়া চিন্তার হাত হইতে অনেকটা নিস্তার পাইল। পরদিন হাওড়াতে ট্রেন থামিলে সে নামিয়া পড়িল। চারিদিকে কোলাহল। হরিচরণের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃ-প্রকৃতির বেশ একটা মিল ঘটিল। পদব্রজে হাঁটিয়া সে কলিকাতায় এক হোটেলে গিয়া আশ্রয় লইল।

সিংহলে ফিরিয়া যাইতে সে একপ্রকার মনস্থই করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। এ স্থান ত্যাগ করিলে যূথিকার আশা তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। তাহাকে পাইবার আশা খুবই কম বটে, তথাপি সব ভরসা একেবারে ত্যাগ করিতে হরিচরণের প্রাণ চায় না। সহরের আমোদপ্রমোদ, ক্রীড়া-

কৌতুকের মধ্যে দুঃখ ও অশান্তি ভুলিবার আশায় কিছুদিন কলিকাতাতে থাকাই সে স্থির করিল। অশোক বাবুর নিকট হইতে পারিশ্রমিক স্বরূপ সে যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া ভদ্র সন্তানের ন্যায় জীবন যাপন করিতেই সে মনস্থ করিল। পরদিনই দোকান হইতে সে নূতন মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিল। সহরে আমোদ-প্রমোদের কিছুরই অভাব নাই। হরিচরণ তাহাতে মত্ত হইয়া দুঃখকষ্ট সব ভুলিবার চেষ্টা করিল। অন্য কেহ হইলে হয় ত এ অবস্থায় সহরের নানা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিত; কিন্তু হরিচরণের চরিত্র সে ভাবে গঠিত হয় নাই। অধিকন্তু যূথিকার প্রতি তাহার ভালবাসাও তাহাকে এই অসৎপথ হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিত।

সেখানে কাহারও সহিত সে আলাপ পরিচয় করিল না। কেবল সেই হোটেলেরই অজিত নামে একজন বাসাড়িয়ার সহিত তাহার একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। অজিতের দেশ বাঙ্গালায়, কিন্তু কার্য্যগতিকে সিংহলেই সে বসবাস করিয়াছে। কিশোর বয়সে নিরাশ্রয় অবস্থায় মাত্র দশ টাকা পকেটে করিয়া সে কর্ম্মের সন্ধানে সিংহল যাত্রা করে এবং সেখানে চা বাগানে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছিল। সে দিন কতকের জন্য কলিকাতা সহর বেড়াইতে আসিয়াছিল।

দু'জনে এক সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ দর্শনে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিচরণ কিন্তু যূথিকার চিন্তা কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

একদিন অজিত আহারাদি শেষ করিয়া ধূমপান করিতে করিতে

বলিতে লাগিল,—"আমাকে শীঘ্রই আবার সিংহলে ফিরে যেতে হবে। দেবপাল বাবু আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

হরিচরণ ধূমপান করিতেছিল। দেবপালের নাম শুনিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অজিতও শ্রোতার উৎসাহ দেখিয়া আনন্দসহকারে বলিতে লাগিল,—"সুন্দর জায়গা। কলম্বোর কাছেই দেবপাল নামে একজন সিংহলী বাস করে। চা বাগানের মালিক, বড় সজ্জন। অমন ভাল লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে বড়ই বিরল। তিনি আমাকে আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট করেছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। কিছুদূরেই তাঁর আর একটী চা বাগান আছে। ঐ বাগানেও বেশ চা উৎপন্ন হচ্ছে, দু পয়সা লাভও হচ্ছে।"

এ সংবাদ শ্রবণে হরিচরণ বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে নিজের হাতে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঐ বাগানে চাষ করিয়াছিল। আজ তাহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। কিন্তু লাভের কথায় তাহার মানসিক উত্তেজনা একটুও লক্ষ্য হইল না। পৃথিবীর সকল ধনরত্ন বিনিময়েও সে আর যূথিকাকে লাভ করিতে পারিবে না!

অজিত বলিতে লাগিল,—"একটা বাগান নিয়েই দেবপাল এত ব্যস্ত যে, নতুন বাগানটা দেখবার আদৌ সময় পায় না। আমি তার সঙ্গে ভাগে কাজ চালাবার প্রস্তাব করি। সে তাতে সম্মত হয়ে আমার কাঁধেই সব কাজের ভার চাপিয়েছে। এক-তৃতীয়াংশ লাভ আমার ভাগে পড়েছে।"

"বেশ ভাল বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু ভাগ যখন সমান সমান

হলো, তখন এক তৃতীয়াংশ কেন, আপনার ত লাভের অর্দ্ধেক পাওয়া উচিত ছিল।"

"না, তা নয়। একভাগ দেবপালের, এক ভাগ আমার, আর এক ভাগ দেবপালের একজন অংশীদার আছে, তার জন্য। এই অংশীদারকে তারা চা বাগানের অর্দ্ধেক ভাগ দিয়েছিল। লোকটিও বড় দক্ষ, সৎ ও পরিশ্রমশীল। সবাই তার গুণে মুগ্ধ হয়েছিল। তার নাম হরিচরণ। দেশ হতে কি সংবাদ পেয়ে একদিন হঠাৎ সে সিংহল ত্যাগ করে চলে যায়।"

হরিচরণ চিন্তিতভাবে চুরুটের ধূমরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অজিতের সহিত তাহার এই অদ্ভুত মিলনের বিষয় ভাবিয়া সে বড়ই বিস্মিত হইল। অজিত যে তাহারই কথা বলিতেছে, সেই যে চাবাগানের একজন অংশীদার এ সব বুঝিতে তাহার একটু বিলম্ব হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া একবার তাহার মনে হইল অজিতকে বলে,—"আমারই নাম হরিচরণ। চল, আমরা কালই সিংহলে যাত্রা করি।"

কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সংযত করিয়া লইল এবং দেবপালের উদারতার বিষয় ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু লাভের ভাগ লওয়া ত তাহার উচিত নহে। প্রথমতঃ উহাতে তাহার যে অংশ আছে, তাহা কাগজ কলমে কিছুই লেখা পড়া নাই। দ্বিতীয়তঃ হরিচরণ স্বেচ্ছায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া লাভের অংশও ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সদয় ব্যবহারে সে বড়ই আকৃষ্ট হইল এবং পুনর্ব্বার তাহাদের নিকট গিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু যূথিকাকে দেখিবার আশাও একেবারে ত্যাগ করা

তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর,—বড়ই শক্ত! স্থির করিল, যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহার প্রফুল্ল বদনকমলখানি দেখিয়া যাইবে। সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও সে মুখ স্মরণে তাহার অনেকটা শান্তি লাভ হইবে। যুথিকা সুখে আছে জানিয়াও সে সুখী হইবে।

অজিত আবার বলিল,—"আচ্ছা, এক কাজ করলে ত হয়, আপনি আমার সঙ্গে চলুন না? আপনার এখানে ত কাজকর্ম্মের সুবিধা দেখছি না। এ কথা বন্ধু হিসাবেই আপনাকে বলছি; কিছু মনে করবেন না।"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখবো।"

সে রাত্রি অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া হরিচরণ একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় পরদিন সন্ধ্যায় সে একাকী এক বায়স্কোপে অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হইল। হরিচরণ আসন গ্রহণ করিয়া একবার উদাস দৃষ্টিতে দর্শকবৃন্দের দিকে তাকাইল। এ কি! ও কাহারা বসিয়া রহিয়াছে! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে, না, সত্য ঘটনা! এ যে যোগমায়া যুথিকা ও বেলা। তাহার অন্তঃকরণ নাচিয়া উঠিল; দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়া জড় হইল। যুথিকা একই ঘরে তাহার সহিত রহিয়াছে, ডাকিলে সে শুনিতে পাইবে, এ কথা এত সহজে তাহার মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তাহার হৃদয়ের স্পন্দন এত দ্রুত হইতে লাগিল, যে ভয় হইল পাছে পার্শ্ববর্ত্তী লোক তাহা শুনিয়া ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময় ও আনন্দের স্থলে উদ্বেগ ও চিন্তা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিল। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, যুথিকার মুখ বিমর্ষ, দেহ বিবর্ণ ও শীর্ণ, যেন কোন অসুখে সে ভুগিতেছে।

সে কিছুতেই যূথিকার মুখ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যতই দেখে, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, যূথিকার চেহারার ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তারকার ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। দৃষ্টি উদাসীন। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? হরিচরণ ভাবিতে লাগিল, এমন সময় অভিনয়ের প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হইল। দশ মিনিট সময় অবসর; ইতিমধ্যে নরেন্দ্র আসিয়া যূথিকার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল।

অভিনয় শেষ হইলে, নরেন্দ্র রমণীত্রয়কে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজে পদব্রজে চলিয়া গেল। হরিচরণ তখন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া পিছু পিছু গিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিল।

যূথিকার ত দর্শন লাভ হইল! কিন্তু তাহার মুখ এত বিষণ্ণ কেন? এই বিষণ্ণ মুখমণ্ডল কি সে অবশিষ্ট জীবনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দূরদেশে লইয়া যাইবে? যূথিকা এত অসুখীই বা কেন? তবে কি তাহার কোন অসুখ বিসুখ করিয়াছে? শেষবার যখন তাহাকে সে দেখে, তখন ত বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লই দেখিয়াছিল!

(১৫)

যোগমায়া ও বেলা বেশ মনের স্ফূর্ত্তিতেই কলিকাতায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। অশোক বাবু তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন কিন্তু দু'দিন পরেই বিশেষ কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাঁহার ছুটি তখনও শেষ হয় নাই। নরেন্দ্রও প্রয়োজনীয় কর্ম্মের অছিলা করিয়া দু'একদিন কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছে। এখানে আসিয়াও যূথিকার দু'এক-

বার সেই পূর্ব্বের মতন মূর্চ্ছা হইয়াছিল। যূথিকা উহা সামান্য বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও, যোগমায়া ও বেলা তাহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

একদিন পত্র আসিল যে, অশোক বাবু দেশে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। যোগমায়া এ সংবাদ পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন এবং ভগিনীদ্বয়ের পরামর্শে দেশে যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু ভগিনীদ্বয় আরও কিছুদিন সহরে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। যোগমায়া তাহাতে কোনও আপত্তি না করিয়া তাহাদের বাসায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে যূথিকা উকিল গোপাল বাবুর নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র পাইল যে, উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ প্রায়, আর মাত্র দিনকতক অবশিষ্ট আছে।

যোগমায়ার নিকট হইতে প্রত্যহই সংবাদ আসিতে লাগিল। অশোক বাবু ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছেন এবং সুস্থ হইলেই যোগমায়া তাঁহাকে লইয়া ভগিনীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইবেন।

একদিন সন্ধ্যায় আহারাদি শেষ করিয়া বেলা বাগানের সম্মুখে দরজায় ঠেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সান্ধ্য প্রকৃতির শোভা বড়ই রমণীয়। পল্লীটি নিস্তব্ধ। বেলা মনের আনন্দে মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিল। এমন সময় অদূরে মনুষ্যের পদধ্বনি শুনিতে পাইল। সে দিকে তাকাইয়া দেখিল এক বলিষ্ঠ যুবক বৃক্ষশ্রেণী ভেদ করিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া বেলা তাহাকে চিনিতে পারিল এবং দরজা খুলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইল।

"হরিচরণ!"

হরিচরণ যেন পাপী ব্যক্তির ন্যায় বলিল,—"চুপ করুন; দয়া করে চেঁচাবেন না।"

"না, তা ভয় নেই। তুমি হঠাৎ বিন্ধ্যাচল ত্যাগ করে চলে গেলে কেন? তুমি দেখছি খুব দামী পোষাক পরেছ? এ সবের অর্থ কি?"

"আপনার দিদি বোধ হয় বেশ সুস্থ আছেন?"

"হাঁ, তা আছে, মন্দ নয়। আমার প্রশ্নের উত্তর আগে দাও-না।"

হরিচরণ মাথা নীচু করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল,—"আপনি আমার অন্তঃকরণের কথা নিশ্চয়ই জানেন। আমি আপনার ভগিনীকে ভালবাসি।"

"আমি জানি। প্রথম থেকেই আমি তা লক্ষ্য করে আসছি। তার পর?"

"আপনি বোধ হয় মনে মনে হাসছেন, আর ভাবছেন একজন সামান্য মাঝি আপনার ভগিনীকে ভালবাসতে সাহসী হয়েছে!"

"এ পোষাকে তোমাকে ত সাধারণ মাঝি বলে বোধ হচ্ছে না। আর তা হ'লেও পবিত্র প্রেম বংশগত সব পার্থক্য দূর করে দেয়। তা, তুমি যদি যথার্থই আমার ভগিনীকে ভালবাস, তা'হলে পুরুষ মানুষের মতন ব্যবহার কর। যূথিকাকে সে বিষয় তোমার জানান উচিত। বুঝতে পারলে? আর দেরী করে কাজ নেই। কাল বিকালবেলা আমরা ইডন-গার্ডেনে বেড়াতে যাবো। তুমি তখন সেখানে উপস্থিত থেকো!"

হরিচরণ তাহাতেই সম্মত হইয়া ফিরিয়া গেল এবং পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইডন-গার্ডেনে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরে ভগিনীদ্বয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বেলা বলিয়া উঠিল,—"এই যে হরিচরণ! কেমন আছ?"

হঠাৎ হরিচরণকে দেখিয়া যূথিকার বদনমণ্ডল লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার পর বেড়ান শেষ হইয়া গেলে, বেলা হরিচরণকে তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করিল। হরিচরণ ভগিনীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। ক্ষুদ্র বাড়ীটী তাহাদের হাস্য-কৌতুকে মুখরিত হইয়া উঠিল। হরিচরণের শতবার ইচ্ছা হইল যে, যূথিকাকে প্রাণের কথা সব খুলিয়া বলে, কিন্তু তাহার মুখ খুলিল না। শেষে চা পান করিবার পর অন্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া কল্য সন্ধ্যায় আসিবে বলিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন যূথিকাকে বড়ই সুন্দর ও প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল। এত স্ফূর্ত্তির সহিত তাহাকে কোনও দিন কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায় নাই। হরিচরণ স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গৃহে ফিরিয়া গেল।

পরদিন যূথিকা শয্যাত্যাগ করিয়া এ ঘর ও ঘর গুন্‌গুন্ স্বরে গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিকালে কার্য্যের অছিলা করিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিল এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চা খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে যূথিকা যত্নপূর্ব্বক সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে আপনাকে সজ্জিত করিল। সাজসজ্জার প্রতি এত যত্ন সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। আজ তাহার মনও বেশ প্রফুল্ল। যূথিকাকে সুখী দেখিয়া বেলারও আনন্দের সীমা রহিল না। এই পরিবর্ত্তনের কারণও বুঝিতে তাহার বেশী দেরী হইল না।

জলযোগ করিয়া চা-পান করিবার নিমিত্ত তাহারা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বসিল। এমন সময় হরিচরণও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান

করিল। বেলা তাহাকে যূথিকার পার্শ্বে বসিবার জন্য চেয়ার দিল। দু'চার কথার পরই বেলা হরিচরণের জন্য চা আনিতে উঠিল। হরিচরণ যূথিকার সহিত কথা কহিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এ কি! যূথিকার চেহারা মৃতব্যক্তির ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে; তাহার চায়ের পিয়ালা হাত হইতে পড়িয়া গেল। যূথিকা অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িল! হরিচরণ হত-বুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এমন করছেন কেন? শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে?"

"না, না, চেঁচিয়ো না। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।"

বেলা হরিচরণের চা লইয়া হাজির হইল। যূথিকা তাহাকে কার্য্যান্তরে অন্যত্র পাঠাইল।

হরিচরণ ব্যগ্রভাবে যূথিকার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। যূথিকার ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন কোন অশরীরী আত্মার সহিত সে কথা কহিতেছে। যেন কোন কথা বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল ঠোঁটই নাড়িতেছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় নীল হইয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া হরিচরণ ভীত হইয়া উঠিল। সে বেলাকে ডাকিতে উদ্যত হইলে যূথিকা হাত নাড়িয়া তাহাকে বারণ করিল, বলিল,—"শোন, আমি—আমি বলছি; কিন্তু বলতে বড়ই বাধ বাধ ঠেকছে। যা হোক্, আর দেরী করতে পারি না! তুমি সে কথা শুনে আমার বিষয় কি ধারণা করবে, তাও ভাববার আমার অবসর নেই। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তা শুনে তুমি বোধ হয় বড়ই বিস্মিত,

স্তম্ভিত হবে। কথাটা হচ্ছে এই—"তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল; হস্তদ্বয় ক্রোড়ের উপর চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি হরিচরণের মুখের উপর নিবদ্ধ,—"তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি আছ?"

এ কথা শুনিয়া হরিচরণ আদৌ বিস্মিত হইল না। তাহার অন্তরাত্মাও নাচিয়া উঠিল না। তাহার মনে হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। যূথিকার ন্যায় লজ্জাশীলা মুখচোরা স্ত্রীলোককে স্বয়ং পুরুষের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে শুনিয়া সে একটুও বিস্মিত হইল না। অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোতে তাহার সমস্ত দেহ মন প্লাবিত হইয়া গেল।

যূথিকা উত্তরের আশায় তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

"আমার আবার সম্মতির প্রয়োজন কি? তুমি ত জানো, আমি নিশ্চয়ই সম্মত হব।"

"আমার এ প্রগল্‌ভতার কারণ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এখন এর উত্তর কিছু পাবে না। কিছুদিন পরে সব জানতে পারবে।"

হরিচরণ তাহাতেই সম্মত হইল। একবার আত্মপরিচয় প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে পরক্ষণেই সে ভাব সংযত করিল।

"আর একটি বিষয় তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আমাদের বিবাহের কথা তুমি কাকেও বলতে পারবে না। এমন কি বেলাকেও নয়। তাকে বলবার দরকার হয়, আমিই বলবো। আর বিবাহ-কার্য্যও যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। বিবাহের পরেই আমরা পৃথক থাকবো, তখন পত্রে তোমাকে সব কথা খুলে জানাবো।"

এ সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হরিচরণের ইচ্ছা হইল না। সব স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও সত্য ঘটনা। যূথিকা তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত

বিবাহের জন্য সব আয়োজন করিতে হরিচরণ সে দিন শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গেল। যূথিকার মনে হইল, সে একটা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। কারণ আজ কালের সামাজিক জীবনে স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিতে সাহস করে না!

বেলা গুন্ গুন্ করিতে করিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। যূথিকা তাহাকে পাশে ডাকিয়া বলিল,—"একটা কথা আছে; শুনে তুমি বড়ই বিস্মিত হবে। হরিচরণের সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। এই হরিচরণই হচ্ছে, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পুত্র অমিয়কুমার!"

বেলা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন এ কথা সে আজ নূতন শুনিল না।—"বহুদিন পূর্ব্বেই আমার সে সন্দেহ হয়েছিল। প্রথম যেদিন তাকে আমি মির্জ্জাপুরে বাগানে দেখি, সেইদিনই এ ধারণা আমার মনে জন্মেছিল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে সে প্রতি পদে পদে ধরা পড়তো। তুমি কবে জানতে পারলে, শুনি?"

"নৌকায় সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রে। কিন্তু বেলা সাবধান, হরিচরণ না জানতে পারে, আমরা তাকে চিনতে পেরেছি। তা হলে এ বিবাহে সে কিছুতেই রাজি হবে না।"

"কেন?"

"এ আবার বুঝিয়ে দিতে হবে? আমাকে বিবাহ করে পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করতে সে কোনমতেই সম্মত হবে না। সে মনে করেছে, আমি তার আসল পরিচয় পাই নি। তাই বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে। গোপাল বাবু লিখেছিলেন যে অমিয়কুমার কাগজে কলমে লিখে দিয়েছে আমাকে বিবাহ করে কিছুতেই সে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবে না।

সে কাগজটুকুও আবার তিনি কোথায় রেখেছেন, খুঁজে পান নি। বোধ হয় হারিয়ে গেছে। হরিচরণের যে পরে এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হবে, তা বিশ্বাস হয় না। আমিও আর দেরী করতে পারি না। উইলের নির্দ্দিষ্ট দিন শেষ হলো বলে। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি কাজ সারবার মতলবে আমি নিজে উপযাচক হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছি। এ বিবাহের কথা কেউ জানতে পারবে না। তার কারণ জিজ্ঞাসা করো না! হরিচরণকেও বলি নি। সে তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে।”

(১৬)

হরিচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। তাহার মনের ভাব তখন বর্ণনাতীত, সে তখন অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছে। এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যূথিকাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবে না। আর প্রশ্ন করিবারই বা প্রয়োজন কি? মরুভূমিতে তৃষাতুর পথিকের পানপাত্র বিচার করিবার সময় থাকে না, ইচ্ছাও হয় না। তাহার জল পাইলেই হইল। কোথা হইতে জল আসিল সে প্রশ্ন করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। রাত্রে তাহার আদৌ ঘুম হইল না।

পরদিন অজিতের সহিত তাহার দেখা হইল। অজিত তাহাকে সিংহলে যাইবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিল। হরিচরণ একেবারে কথা না দিলেও, অনেকটা সম্মতি জানাইল। সমস্ত দিন বিবাহের সব বন্দোবস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময় যূথিকাকে গিয়া সব সংবাদ দিল। স্থির হইল, পরদিন দুপুর বারটার সময় কলিকাতার এক ব্রাহ্ম আচার্য্যের বাড়ী

বেলা ও যূথিকা হরিচরণের সহিত দেখা করিবে। সেইখানেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পরদিন দুপুরে ভগিনীদ্বয় নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে হাজির হইল। হরিচরণ পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত ছিল। আচার্য্য যথারীতি শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলে হরিচরণ যূথিকার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল। তাহার আনন্দ দেখে কে? যূথিকা আজ তাহার স্ত্রী। প্রাণের শ্রেষ্ঠ বাসনা তাহার পূর্ণ হইয়াছে! অসম্ভব ভাবিয়া যাহা সে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। ইহা কি সত্য? না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে!

ভগিনীদ্বয় গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী রওনা হইল। হরিচরণও তাহাদের সহিত চলিল। কিন্তু যূথিকার কথামত সে অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিল। বাড়ী আসিয়া যূথিকার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়িয়া একটু শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

হরিচরণ ও বেলা দুজনে মনের আনন্দে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হইল। বেলা বলিল,—"সারাদিন পরিশ্রমের পর দিদি একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনি উঠবে। সত্যি হরিচরণ তুমি বড়ই সুখী। যূথিকার মতন স্ত্রীরত্ন লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। আমি পুরুষমানুষ হলে, তোমার অবস্থা দেখে আমার হিংসা হতো। আমি জোর করে বলতে পারি যে অমিয়কুমারের ন্যায় সুখী লোক আজ পৃথিবীতে বড় বিরল—"

হরিচরণ চমকিয়া বেলার মুখের দিকে তাকাইল।

বেলা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বড়ই ভীত হইল। কিন্তু যাহা

বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার নহে। বৃথা অনুতাপ করিয়া আর কি ফল হইবে? সে কম্পিত স্বরে বলিল,—"হরিচরণ, আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি।" হরিচরণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কঠোর দৃষ্টিতে সে বেলার পানে চাহিয়া বলিল,—"আপনি তা হলে আমাকে অমিয়কুমার বলে জানতেন?"

"হাঁ, আমি জানতাম।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলাকে ইহা স্বীকার করিতে হইল।

"কবে আপনি জানতে পারলেন?" হরিচরণ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল।

"যেদিন প্রথম তোমায় মির্জ্জাপুরে দেখি। অন্ততঃ সে রাত্রে তোমাকে বাগানে দেখে আমার মনে তাই ধারণা হয়েছিল।"

হরিচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আর যূথিকা? তিনিও জানতেন? কবে থেকে?"

"কবে থেকে?" বেলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—"ও হরিচরণ—অমিয়কুমার—অমন করে আমার সঙ্গে কথা কচ্ছো কেন? ও ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? হঠাৎ এমন রেগে উঠবারই বা কারণ কি?"

"আমি রাগ করি নি। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি সত্য ঘটনা জানতে চাই। কবে তিনি এ কথা জানতে পারলেন?"

"সেই ঝড়ের দিন নৌকায়—"বেলা যেন জোর করিয়া কথা বলিল,—"তুমি ভুলে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিলে। তাতে আর কি এসে

যায় ? তুমি অত রাগছো কেন ? তুমি তাকে ভালবাস, বিবাহ করেছ সে এখন তোমার স্ত্রী—"

"ঝড়ের দিন ? হাঁ, মনে পড়েছে। সেই দিন থেকে ! এতদিন তাহ'লে আমার কাছে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ! এখন সব বুঝতে পারছি। সব রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে।" হরিচরণ তীব্রভাবে হাসিতে লাগিল। সে হাস্যে বেলার অন্তরদেহ কাঁপিয়া উঠিল।

"তুমি কি বুঝতে পেরেছ ? কি ভাবছো এত ? হরিচরণ,—অমিয়কুমার জানি না কি নামে তোমাকে ডাকবো ! তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছো কেন ? এর জন্য তুমি নিশ্চয়ই দিদির প্রতি নিষ্ঠুর—"

"না, নিষ্ঠুর হবো না। এতদিন ধরে আপনারা জানেন আমি কে ; অথচ সে কথা লুকিয়ে রেখে আমাকে প্রতারিত করেছেন। কেন, তা আমি জানি। এখন আমার চোখ ফুটেছে। বিবাহের কারণও বেশ বুঝতে পারছি। পৈতৃক সম্পত্তি যাতে আমার হস্তগত হয়, তাই উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার মনের ভাব তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। আর কিছু বলতে হবে না—আমি শুনতে চাই না। আমাকে বোকা বানিয়েছেন। কিন্তু এখন আমার চৈতন্য হয়েছে। আমি সব বুঝতে পারছি। স্বার্থত্যাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি এ কাজ করেছেন। আমার বিষয় একবারও ভাবেন নি।"

বেলা উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"হরিচরণ, তুমি ভুল বুঝেছ। দিদি তোমাকে যথার্থই ভালবাসে—"

হরিচরণ তাহাকে দূরে সরাইয়া দিল।

"মিথ্যা কথা! তিনি আমাকে একটুও গ্রাহ্য করে না। একটাও ভালবাসার কথা একদিন তিনি মুখে উচ্চারণ করেন নি। আমি এখন সব বুঝতে পারছি। নিজের খেয়াল সফল করবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের স্বার্থ বলি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর এ স্বার্থত্যাগেরও প্রশংসা করতে পারছি না।"

বেলা পুনর্ব্বার তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"হরিচরণ, তুমি ভুল বুঝেছ। বস, আমি তাকে ডেকে আনছি।"

"না না, তাঁকে আর ডাকতে হবে না। তাঁর এ মহান আত্মোৎ-সর্গের ফল গ্রহণ করতে আমি সম্মত নই। আমি কি এতই নীচ, যে তাঁর এই স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ভোগ করবো? তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলেন 'বিবাহের পরেই আমরা পৃথক্ থাকবো'—সেই কথাই ভাল। আমি চল্লাম।—"

বেলা মানসিক যন্ত্রণার বেগে হাত নাড়িতে নাড়িতে কাঁদিয়া বলিল,—"হরিচরণ, হরিচরণ, সে যথার্থই তোমাকে ভালবাসে। একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকে ডেকে আনি।"

'না, আর যেতে হবে না। আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। সে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। আমি চলে গেলে, তাঁকে ডেকে সব বলবেন। আমি চিরদিনের জন্য চল্লাম।"

হরিচরণ টেবিলের নিকট গিয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিল। সেটুকু বেলার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল,—"এই নিন। কাগজটুকু তাঁকে দিবেন। আমি বিষয় সম্পত্তি সব ত্যাগ করলাম। আমি ওসব কিছুরই প্রত্যাশী নই।"

বেলা তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। হরিচরণ বলিতে লাগিল,—"আপনি ছেলেমানুষ! এ সব কিছু বুঝবেন না। যূথিকা উঠলে তাঁকে এই কাগজটুকু দিবেন। তাঁকে বলবেন ভবিষ্যতে কখনও আমি তাঁকে স্ত্রী বলে দাবী করবো না। আর তাঁর সঙ্গে যাতে পরেও সাক্ষাৎ না হয়, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া গেল। বেলা তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু হরিচরণ আর পিছনে তাকাইয়াও দেখিল না। দ্রুত পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

(১৭)

হরিচরণ অজিতের সহিত সিংহলে ফিরিয়া গেল। সে আসিবে বলিয়া দেবপাল পূর্ব্বে কোনও সংবাদ পায় নাই। ফিরিয়া আসাতে বাড়ীর সকলেই আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। কেবল লুলিয়া হরিচরণের প্রত্যাবর্ত্তনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; এমন কি তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেও আসিল না।

হরিচরণ লুলিয়ার অন্বেষণে গিয়া দেখিল, সে টবে কাপড় চোপড় কাচিতেছে। হরিচরণকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

"লুলিয়া, আমি আবার ফিরে এলাম। তোমাকে দেখে এখন বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। আমি ফিরে আসাতে তুমি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছ?"

লুলিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"হাঁ। আপনি দেশে বেশ সুস্থ ছিলেন? আপনাকে একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে।"

হরিচরণ ঈষৎ হাসিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। লুলিয়াও স্ব-কার্য্যে ব্রতী হইল।

কয়েক দিনের মধ্যেই হরিচরণ আবার স্থানীয় সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। যূথিকার সম্বন্ধে তাহার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। সে যে তাহাকে কেবল মাত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী করিবার জন্যই স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, এ ভ্রান্তি তাহার মন হইতে কিছুতেই দূর হইল না।

নূতন চা বাগানে খুব ফসল হইতে লাগিল। হরিচরণের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই ফলিয়া গেল। উৎকৃষ্ট মূল্যবান চা সেই জমিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এ সংবাদ ক্রমেই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বাগান লুঠ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্ব্বৃত্তেরা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অজিত ও হরিচরণ বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সহিত তাহাদের আক্রমণ হইতে সে স্থান অতি সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন অজিত বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেবপালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। সে রাত্রে হরিচরণ একাকীই বাগানের মধ্যে কুটীরে থাকিয়া বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। মাথার শিয়রেই একটি শাণিত ছোরা ঠিক করিয়া রাখিল। অৰ্দ্ধরাত্রে হঠাৎ মনে হইল কে যেন তাহার দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা মারিতেছে। ছোরাটি হাতে করিয়া হরিচরণ অতি সাবধানে দরজা খুলিয়া দিল। দেখিল, লুলিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া। লুলিয়া হরিচরণের সেবা করিবার জন্য তাহার সহিত এখানে আসিয়াছিল। সে এই বাগানের গায়েই একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে বাসা লইয়াছিল।

হরিচরণকে দেখিয়া লুলিয়া বলিল,—"বাগানের আশে পাশে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ঘরের পিছন দিয়ে গুঁড়িসুড়ি মেরে তাকে আসতে দেখেছি।"

"আচ্ছা আমি এর বন্দোবস্ত করছি।" এই বলিয়া হরিচরণ ঘরের যে কোণে আলো ছিল, সেখানে পুরাতন থলিয়া দিয়া এক মনুষ্যাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিল। দূর হইতে দেখিলে সেটাকে মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। পরে দরজা ভেজাইয়া দিয়া কুটীরের মধ্যে দুইজনে লুকাইয়া রহিল।

আগন্তুক দরজা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। আলোর সম্মুখস্থ মূর্ত্তিটা মানুষ মনে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। আলোতে হরিচরণ লোকটাকে বেশ চিনিতে পারিল। এই লোকটারই হাত হইতে সে একদিন লুলিয়াকে উদ্ধার করিয়াছিল। লোকটা সেই মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখীন হইবা মাত্র হরিচরণ পিছন হইতে তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল। সে তখন হরিচরণের গলদেশ ধরিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। লুলিয়া ইতিমধ্যে সাহসে ভর করিয়া হরিচরণের পকেট হইতে ছোরা লইয়া দুর্ব্বৃত্তের বুকের উপর তুলিল। সে তখন নিরুপায় হইয়া চেঁচাইয়া বলিল,—"আমি আর কিছু করবো না। আমাকে মেরো না।"

হরিচরণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং তাহার জামার পকেট হইতে একখানা বড় ছোরা, কয়েকটি মুদ্রা, ও তিনখানি পুরাতন ময়লা খাম বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পরে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"তুমি কি জন্য এখানে এসেছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।" এই বলিয়া হরিচরণ একবার লুলিয়ার দিকে চাহিল—"তোমাকে এখনি আমি

ছোরা দিয়ে বধ করতে পারি, কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে ইচ্ছা করি না। তুমি আজই এ দেশ ত্যাগ করে যাও। কাল যদি আবার তোমাকে এ অঞ্চলে দেখতে পাই, তাহলে আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। বুঝতে পারলে?"

লোকটা গোঁ গোঁ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন টেবিলের উপরিস্থিত সেই খাম কয়খানির উপর হরিচরণের নজর পড়িল। অমনি সে বিস্ময়ের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনখানি খামেতেই তাহার নাম ও ঠিকানা লেখা আছে,—শ্রীঅমিয়কুমার বসু, কলম্বো। হরিচরণ খামের ভিতর হইতে চিঠি কয়খানি খুলিয়া পড়িল। সবগুলিই গোপাল বাবুর পত্র। তিনি তাহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় তাহার মনের মধ্যে পুরাতন কথা সব জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতার মৃত্যু, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন, যূথিকার ও বেলার সহিত সাক্ষাৎ, বিবাহ, দুঃখ ও নৈরাশ্য যুগপৎ তাহার স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া তুলিল। চিঠিগুলি তাহার হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল! আর একটা গভীর সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উদিত হইল। তবে কি এই দুর্ব্বৃত্ত, যাহার নিকট হইতে পত্রগুলি পাওয়া গেল, নরেন্দ্রেরই গুপ্তচর? নচেৎ তাহার নিকট এই পত্রগুলি কি প্রকারে আসিয়া পৌঁছিল? নরেন্দ্র নিশ্চয়ই তাহার উপর নজর রাখিবার জন্য এবং সম্ভবপর হইলে, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এই লোকটাকে এ অঞ্চলে পাঠাইয়াছে। তাহার ধারণা হইল যে এই লোকটাকেই কলম্বোতে দু'চার বার তাহার অনুসরণ করিতে সে লক্ষ্য করিয়াছে। সে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা-সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। লুলিয়া নিকটে আসিয়া এক-

খানি পত্র তুলিয়া লইল। হরিচরণ পত্রখানি তাহার নিকট হইতে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

"আমি সব জানি—অমিয় বাবু!"

"তুমিও জান?"

"হাঁ, বহুদিন আগে থেকেই আমি জানি। যে দিন ঐ লোকটার হাত হতে আপনি আমাকে প্রথম উদ্ধার করেন, সেই দিন থেকে। জানতাম বলেই আমি একজনের মুখে পুরাতন খবরের কাগজে আপনার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে সেখানি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আপনাকে পড়তে দিই। তিনি বলেছিলেন আপনার পিতাকে তিনি চিনতেন। মির্জ্জাপুরেই আমার জন্মস্থান। আপনার পিতার কারবারেই আমি কাজ করতাম। মনে করেছিলাম, দেশে ফিরে গিয়ে আপনি পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। কিন্তু এ দেশে আবার কেন ফিরে এলেন, তা কিছুই বুঝতে পারছি নি।"

মানবজীবনে এমন মুহূর্ত্তও আসে, যখন অতি বড় পাষাণ-প্রকৃতি লোকেরও হৃদয় বিগলিত হয়, মূকও বাক্‌শক্তি লাভ করে। দুঃখ ও নৈরাশ্যের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হরিচরণ অনেক কষ্টে কাজে মন দিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন চিঠি কয়খানি দেখিয়াই তাহার সেই অতীতের দুঃখসিন্ধু পুনরায় উথলিয়া উঠিল। লুলিয়ার সহানুভূতিসূচক কথাবার্ত্তা শুনিয়া অজ্ঞাতসারে সে বলিয়া ফেলিল,—"হাঁ, আমিই অমিয়কুমার। তোমার প্রদত্ত খবরের কাগজ পড়েই আমি দেশে যাত্রা করি।" এই বলিয়া হরিচরণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ দেশে যাওয়া হইতে যূথিকাকে বিবাহ করা পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সব পরপর লুলিয়ার

নিকট বর্ণনা করিল। শেষে তাহার চৈতন্য হইল, এ কথা তাহাকে বলা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। লুলিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"লুলিয়া, এ কথা কিন্তু তুমি আর কাকেও বলতে পারবে না। তোমাকে এ সব না বলাই উচিত ছিল, চিঠি ক'খানা পড়ে আমার মন বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিশেষতঃ তুমি দেশের লোক, বাবার কারবারে কাজ করতে; তোমাকে পুরাতন বন্ধু মনে করেই এ সব কথা বলেছি, কিন্তু দেখো, যেন আর কাকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলো না। আমি যে অমিয়কুমার, তা ভুলে যাও। আমি হরিচরণ দাস এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ নামেই লোকের নিকট পরিচিত হতে চাই।"

"আমাকে আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এত অকৃতজ্ঞ নই যে, জীবনদাতার একটা সামান্য কথা রাখতে পারবো না। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

এই বলিয়া লুলিয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রি হরিচরণের আর আদৌ ঘুম হইল না।

* * * * *

দু'দিন পরে হরিচরণ হঠাৎ সংবাদ পাইল যে, লুলিয়া বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে সিংহল ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। এ কথা শুনিয়া হরিচরণ একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইল, কিন্তু লুলিয়াকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

(১৮)

হরিচরণ চলিয়া গেলে, বেলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। চঞ্চল চরণে ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ কি করিলে ভগবান?

আমারই দোষে একমুহূর্তে যূথিকার জীবনের সব সুখের শেষ হইয়া গেল! রঙ্গালয়ে মিলনের অভিনয় আরম্ভ হইতে না হইতেই বিদায়ের কৃষ্ণ যবনিকা ফেলিয়া দিলে? বেলার মনে এই সব চিন্তাই কেবল উদিত হইতেছিল, এমন সময় যূথিকা ঘরের ভিতর ঢুকিল।

"বেলা, অমন করছ কেন? হরিচরণ কোথায় গেল?"

বেলা শোকের আবেগে ভগিনীর হাত ধরিয়া বলিল,—"সে চলে গেছে। জন্মের মতন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমারই সব দোষ! আমি ভুলে তার আসল নাম ধরে ডেকে ফেলেছিলাম। অমনি তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বল্লে, তাহ'লে তুমি তাকে ভালবাস বলে বিবাহ কর নি; কেবল তাকে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী করবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থ বলি দিয়েছ। আমি পুনঃপুনঃ তাকে বুঝিয়ে বল্লাম যে এ ধারণা তার ভুল, কিন্তু কোনই ফল হল না; সে আর কখনও আসবে না বলে চলে গেল।"

যূথিকা পার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। পাষাণ মূর্তির ন্যায় সে স্থির, নিশ্চল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিল,—"তাহ'লে সে চলে গেছে!"

"হাঁ, জন্মের মত গেছে, আর ফিরবে না। আমাদের এখন চুপ করে বসে থাকলে হবে না। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

যূথিকা মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, চলে গেছে, ভালই হয়েছে।"

"ভালই হয়েছে! কি যে তুমি বলছো, কিছু বুঝতে পারছি না; তা হতেই পাবে না। একটা কিছু উপায় ঠিক কর। এমন গুরুতর বিষয়ে এত উদাসীন হলে চলবে কেন? তবে কি তুমি তাকে সত্য সত্যই

ভালবাস না? তবে কেন তাকে বিবাহ করলে? এত তাড়াতাড়ি, গুপ্ত ভাবে, এ কাজ করবার উদ্দেশ্য কি?"

"তার পৈতৃক সম্পত্তি সে যাতে পায়, এ চেষ্টা আমি বহুদিন থেকেই করে আসছি, তা তুমি জান। আর বেলা, মানুষের জীবন কবে আছে কবে নেই। আমার শরীর-গতিকও ভাল নয়। মাঝে মাঝে ভয় হয় —"

"এ কি কথা! তুমি বলতে চাও কি আর বেশী দিন বাঁচবে না? এ সব ধারণা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছে?"

"এই যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাই, আমার ভয় হয়, হৃদ্‌যন্ত্র খারাপ হয়ে আসছে। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে বুকের মধ্যে কেমন ধড়ফড় করে ওঠে। বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় বিবাহের পূর্ব্বেই মারা গেলে, কি হত বল দেখি!"

"আমি এখন সব বুঝতে পারছি! কিন্তু হরিচরণকে এমন করে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু কোথায় গেল কিছু জানতে পারলাম না ত! আচ্ছা, তুমি একটুখানি বস, আমি এখনই আসছি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বেলা বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল সোজা ষ্টেশনে গিয়া দেখিল, প্লাটফর্ম্ম জনশূন্য। খবর লইয়া জানিল, একখানা ট্রেন কিছুপূর্ব্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। ভাবিল, হরিচরণ তাহা হইলে সেই ট্রেনেই কলিকাতা গিয়াছে। বাড়ী ফিরিবার সময় বেলা এক ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার যন্ত্রাদির সাহায্যে যূথিকার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম

বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সামান্য দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া টনিকের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা যূথিকার রোগ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। এবার হরিচরণের সন্ধান লইতে সে এক উপায় স্থির করিল। খবরের কাগজে এক সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপন লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

বিজ্ঞাপন যথাসময়ে খবরের কাগজে বাহির হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। ভগিনীদ্বয় দিনের পর দিন উত্তরের অপেক্ষায় আশাপথ চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন সংবাদই আসিল না। মধ্যে মধ্যে গাড়ী করিয়া কলিকাতার রাজপথে দু'জনে ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি হরিচরণের সাক্ষাৎ লাভ হয়, কিন্তু সব চেষ্টাই তাহাদের নিষ্ফল হইল। যূথিকা তখন সিদ্ধান্ত করিল, সে নিশ্চয়ই কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছে। এ দেশে তাহার আর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

এ দিকে যোগমায়ার নিকট হইতে পত্র আসিল, অশোক বাবু বেশ সুস্থ হইয়া আসিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় পুনর্ব্বার অসুখে পড়িয়াছেন। তাহাদের ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে। কিন্তু অশোক বাবু ভগিনীদ্বয়ের সাক্ষাৎ লাভের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

ভগিনীদ্বয় স্থির করিল দেশে ফিরিয়া যাইবে। যতই দিন যাইতে লাগিল, হরিচরণের প্রতি তাহার ভালবাসা কত গভীর যূথিকা তাহা বেশ অনুভব করিতে লাগিল। দিন রাতই কেবল হরিচরণের কথা সে ভাবে। তাহার বিরহে হরিচরণও যে কত কষ্টভোগ করিতেছে, নিজের মনের মধ্যে তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

তাহারা মির্জ্জাপুরে যাত্রা করিল। ষ্টেশনে নামিতেই নরেন্দ্র আসিয়া

তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। যূথিকার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"আপনাকে দেখে এখন বেশ সুস্থ বলেই মনে হচ্ছে। সেদিন অশোক বাবুকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সুস্থ আছেন।"

পরদিন প্রাতে ভগিনীদ্বয় অশোক বাবুকে দেখিতে গেল। তাহাদের বিশেষতঃ বেলাকে দেখিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

তারপর অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু হরিচরণের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

* * * * *

এ দিকে গোপাল বাবু নরেন্দ্রের নিকট হইতে একদিন এক পত্র পাইলেন। পত্রে নরেন্দ্র একখণ্ড জমি কিনিবে বলিয়া গোপাল বাবুর মত চাহিয়া পাঠাইয়াছে। জমি সম্বন্ধীয় দলিল-পত্রও চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। দলিল-পত্র দেখিতে দেখিতে এক টুকরা কাগজ গোপাল বাবুর নজরে পড়িল। একি, এ যে অমিয়কুমারের ত্যাগপত্র! অমিয় যে দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে সেদিন স্বেচ্ছায় এই কাগজ সে লিখিয়া দিয়াছিল। এ কাগজ কি প্রকারে নরেন্দ্রের হস্তগত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর মনে হইল, সে দিন অমিয় এই ত্যাগপত্র লিখিয়া চলিয়া গেলেই নরেন্দ্র এই সব দলিল পত্রাদি লইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল। বোধ হয় সেই কাগজপত্রের সঙ্গে এই কাগজটুকুও চলিয়া গিয়া থাকিবে। তিনি আরও ভাবিলেন, এতদিন এইসব কাগজপত্রের সঙ্গে থাকিলেও নরেন্দ্র এ কাগজটুকু নিশ্চয়ই লক্ষ্য

করে নাই। সে যে ইচ্ছা করিয়াই অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত এটুকু পাঠাইয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিলেন না।

লেখাটুকু দেখিয়াই গোপাল বাবুর মনে পড়িল যে উইলের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উইলের সর্ত্ত অনুসারে যূথিকাই এখন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে একমাত্র পুত্রকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে যথার্থই দুঃখ হইল। কিন্তু তাঁহার আর হাত কি! অমিয়কুমারকে বুঝাইতে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

সে রাত্রে অমিয়কুমারের ব্যবহারে তাহার প্রতি তিনি একটু আকৃষ্টও হইয়াছিলেন এবং এ বিষয়-সম্পত্তি তাহারই হস্তগত হইলে, তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নাই। এ বার আইনসঙ্গত কার্য্য করিতে তিনি বাধ্য। তিনি যূথিকাকে এ বিষয় জানাইবার জন্য তাহাদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র তাহার আফিস-ঘরে কাজ করিতে করিতে ভাবিতেছিল গোপাল বাবু অমিয়কুমারের লেখা কাগজটুকু পাইয়া কি মনে করিতেছেন। অবশ্য গোপাল বাবু কোন প্রকারেই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারেন না। এমন সময় তাহার প্রধান কর্ম্মচারী হারাধন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

"আজ্ঞে, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম। কর্ম্মচারী রামদাস আবার কাজে বড় অবহেলা করছে, সে কথা আপনাকে জানান উচিত ভেবে বলতে এলাম।"

"তাকে জবাব দাও" এই বলিয়া নরেন্দ্র পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

১৯

গোপাল বাবু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যূথিকাকে অমিয়কুমারের লেখা, সেই ত্যাগপত্রটুকু দেখাইয়া এ কাগজ সম্বন্ধে অন্যান্য সব ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। উইলের সর্ত্ত অনুসারে যূথিকাই যে এখন এই অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক, তাহাও বলিতে ভুলিলেন না।

যূথিকা ধীর শান্তভাবে সব কথা শুনিল। তাহার মুখে ও ভাবভঙ্গীতে উত্তেজনা বা উদ্বেগের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। মনে মনে সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। নরেন্দ্র আর কোন প্রকারেই এই সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে না এবং অমিয়কুমারেরও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আর কোনও ভয় নাই। স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল শ্রীতে তাহার মুখমণ্ডল মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যূথিকা দু'দিন পরে ভাবিল, এ বাড়ীতে বাস করা ও অমিয়কুমারের অর্থে নিজের ভরণ পোষণ করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অমিয়কুমার তাহাকে একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছে। কিন্তু বেলা তাহাকে বুঝাইয়া দিল, কাজটা একবারেই ভাল হইবে না। অমিয়কুমার এক দিন ফিরিয়া আসিতে পারে। আসিয়া দেখিবে যে তত্ত্বাবধানের অভাবে তাহার বিষয় সম্পত্তি পাঁচভুতে লুটিয়া লইয়াছে। ইহাই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য? এখানে থাকিয়া স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করাই তাহার একমাত্র কাজ।

পরদিন অপরাহ্নে যূথিকা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিতে দোকানে

দোকানে ঘুরিতেছে, এমন সময় এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড় দেখিতে পাইল। সংবাদ লইয়া জানিল রামদাস নামধারী কোন ব্যক্তি মূৰ্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। ইহা শুনিয়াই তাহার কোমল নারীপ্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে ঘটনাস্থলে অগ্রসর হইয়া গাড়ী করিয়া রামদাসকে হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। উপস্থিত সকলেই উচ্চকণ্ঠে যূথিকার প্রশংসা করিতে লাগিল। কেবল অদূরে একজন হিন্দুস্থানী যুবতী দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ বদনে এই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে যূথিকার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। যূথিকা গাড়ীতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। স্ত্রীলোকটিও গাড়ীর পিছু পিছু চলিল।

পরদিন যূথিকা স্বয়ং হাসপাতালে গিয়া রামদাসের সংবাদ লইল। লোকটি একটু সুস্থ আছে এবং দিনকতকের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে শুনিয়া সে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া সে গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটি নিকটে আসিয়া কাতর স্বরে জানাইল যে সে নিরাশ্রয়, বড়ই দরিদ্র, তাহার নিকট কাজ করিতে চায়। যূথিকা তাহাকে কাজের আশা দিয়া বাড়ীতে দেখা করিতে বলিল।

স্ত্রীলোকটি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী যাইলে যূথিকা তাহাকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে আপনাকে মতিয়া বলিয়া পরিচয় দিল। তাহাকে সাধারণ দাসীর কাজকর্ম্ম করিতে হইত না। যূথিকা তাহার হাতে ভাঁড়ারের চাবি দিয়া সব ভার বুঝাইয়া দিল।

তাহার নম্র ব্যবহার ও সরল স্বভাবের গুণে বাড়ীর সবাই ক্রমে মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

ভগিনীদ্বয় মির্জ্জাপুরে আসিবার পর নরেন্দ্র দু'তিনবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা বাড়ী না থাকায় দেখা পায় নাই, হতাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ আবার সে সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। যূথিকা তাহাকে চা পান করিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র এরূপ ভাব দেখাইল যেন বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিল না।

ভৃত্য যথাসময়ে টেবিলের উপর চায়ের পাত্রাদি সাজাইতে আরম্ভ করিল। যূথিকা তখন কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়াছিল। নরেন্দ্র সেই ঘরের পাশেই বারান্দায় একটু পায়চারি করিতেছিল। এমন সময় মতিয়া সেখান দিয়া যাইতে যাইতে নরেন্দ্রকে দেখিয়াই থামিয়া গেল এবং তাহার মনে একটু সন্দেহও হইল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নরেন্দ্র কিছুই টের পাইল না।

নরেন্দ্র মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ করিতে করিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল দেখিল, চাকরবাকর কেহ কোথাও নাই। তৎক্ষণাৎ বুকপকেট হইতে একটি ছোট শিশি বাহির করিয়া যূথিকার চায়ের পেয়ালায় ঠেকাইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার গুন্ গুন্ করিতে করিতে বারন্দার অপর অংশে চলিয়া গেল।

মতিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া সব দেখিল। তাহার মুখ মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় সাদা হইয়া গেল। সে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া সে ত্বরিত পদে ঘরের

ভিতর ঢুকিল এবং যুথিকার পেয়ালাটি সরাইয়া সেখানে তদ্রূপ অন্য একটি পেয়ালা রাখিয়া দিল। পরে সেই পাত্রটি লইয়া নিজের ঘরে গিয়া দেরাজের ভিতর চাবি দিয়া রাখিল। নরেন্দ্র এবারও কিছুই টের পাইল না।

সে দিন সন্ধ্যার সময় মতিয়া বাড়ীর অপর একজন দাসীর সহিত গল্প করিতে করিতে শুনিল যে, যূথিকার এখন মৃত্যু হইলে নরেন্দ্রই এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সে আরও সংবাদ পাইল যে, যূথিকারও শরীর আদৌ সুস্থ নহে। মধ্যে মধ্যে সে মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হয়। বুদ্ধিমতী মতিয়ার ভিতরের কথা বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না।

রাত্রে কাজ শেষ হইলে, মতিয়া নিজের ঘরে গিয়া সেই পাত্রটি আলমারি হইতে বাহির করিল এবং খানিকটা অপর একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। পরে যূথিকার ঘরে গিয়া চিরুণী দিয়া তাহার কেশ-বিন্যাস করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই চিরুণীটা তাহার হাত হইতে হঠাৎ খসিয়া পড়িল। যূথিকা ফিরিয়া দেখে যে, মতিয়ার সমস্ত দেহ টলিতেছে। কোন রকমে পার্শ্বস্থ চেয়ারে ভর দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে তাহাকে ধরিয়া আরাম-কেদারার উপর শোয়াইয়া দিল। চাকরবাকরদের রাত্রে আর বিরক্ত না করিয়া বেলাকে ডাকিয়া আনিল। বেলা মতিয়ার মুখের ভাব ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়াই বলিল, যূথিকারও মূর্চ্ছিত হইবার সময় ঠিক এইরূপ অবস্থা হয়। দু'চার ঘণ্টা পরেই মতিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু আসল কথা কাহাকেও খুলিয়া বলিল না।

(২০)

পরদিন বিকালে মতিয়া হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করিল। সে দিন রামদাস বেশ সুস্থ ছিল। তাহাকে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বেড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সে একটু বেড়াইয়াই সেখানে বসিয়া পড়িল। দূরে মতিয়াকে আসিতে দেখিয়া কোন পরিচিত স্ত্রী মূর্ত্তি বলিয়া তাহার মনে হইল। নিকটে আসিতেই রামদাস তাহাকে চিনিতে পারিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে ডাকিল, "লুলিয়া!"

মতিয়া সেখানে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাধ্বনি তাহার ওষ্ঠদ্বয় হইতে নির্গত হইল। অল্পক্ষণ পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে সে উদ্যত হইল। রামদাস তখন একটু অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল ও পুনর্ব্বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। রমণীকে লুলিয়ার প্রেতাত্মা বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছিল। মতিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "রামদাস!"

"লুলিয়া, তুমি! ফিরে এসেছ? এতদিন কোথায় ছিলে?"

"আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চলে যাই।"

রামদাস দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, কখনই না। আমাকে সব কথা খুলে না বল্লে, আজ কিছুতেই ছাড়ছি না। অনেক দিন পরে দেখা হল, এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনারাশির আজ লাঘব হবে। বস; আমি বলছি,— বস। এখনও আমার শরীর বড়ই দুর্ব্বল। কিন্তু সব কথা খুলে না বল্লে, তোমাকে ধরে রেখে দেব।"

"পূর্ব্বের চেয়ে তোমাকে অনেকটা ভাল দেখছি। তোমারই সংবাদ নেবার জন্য আমি এখানে এসেছি।"

"তুমি তাহ'লে জানতে আমি অসুস্থ। তাহ'লে কিছুদিন এ দেশে এসেছ? এতদিন আমাকে লুকিয়েছিলে!"

"হাঁ, লুকিয়েই ছিলাম। যে দিন তুমি আহত হও, সে দিন তোমাকে প্রথম দেখি। তোমার সঙ্গে কথা কবার আমি যোগ্য নই,—" এই বলিতে বলিতে তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিল, "আমাকে ছেড়ে দাও, চলে যাই। আমার কথা মন হতে একেবারে ভুলে যাও।"

"তোমাকে ভুলতে পারবো না, লুলিয়া। পারলে, আমারও ভাল হত বুঝতে পারছি। কিন্তু তা হবার নয়। যে দিন তুমি চলে গেলে সে দিন থেকে এক মুহূর্ত্তও তোমার কথা ভুলি নি। কেন আমাকে ছেড়ে গেলে, আজ বল।" তাহার কণ্ঠস্বরে তীব্র যন্ত্রণা ও তিরস্কার মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

"আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছলো; রামদাস, সে কথা আর তুলো না। মনে কর, আমাদের পূর্ব্বে কখনও আলাপ পরিচয় ছিল না।"

"মাথা খারাপ হয়ে গেছলো! তা হতে পারে। তুমি জানতে আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম। আমাকে এরূপভাবে প্রতারণা করে ত্যাগ করে যাওয়া কি তোমার উচিত হয়েছিলো?"

"হাঁ, সে কথা সত্য বটে! কিন্তু সে পাপের আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। সে কথা শুনলে ঘৃণায় তোমাকে মুখ ফেরাতে হবে,—" তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু হইয়া আসিল,—"আমার শিশু সন্তান অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে!" এই বলিয়া মতিয়া হাত দিয়া তাহার মুখ ঢাকিল।

রামদাস শুনিবামাত্র হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"সেই পিশাচের নাম আমাকে বল! তার নাম তোমাকে বলতেই হবে। আমি আর কিছুই চাই না,—কেবল তার নামটা!"

"না তা হবে না। তার নাম জিজ্ঞাসা করবার তোমার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে পারছি। সে কাজ করলে, তোমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সে পিশাচ কঠোর শাস্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হলেও, তার নাম আমি তোমাকে বলবো না। আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, আর বেশী কষ্ট তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি না।"

"যে তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমার জীবনের সব সুখ নষ্ট করেছে, সে বিনা শাস্তিতে পার পাবে, তা হতেই পারে না, এ অসম্ভব!"

"না, শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। রামদাস, মাথার উপর ভগবান আছেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত যথাসময়ে পাপীকে শাস্তি দেন। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় বসে আছি। এখন চল্লাম। তুমি সুস্থ হয়েছ দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে করযোড়ে প্রার্থনা করছি, আমাকে ভুলে যাও। আমার চিন্তা মন হতে দূর করে দাও, নূতন করে জীবনযাত্রা আরম্ভ কর।"

রামদাস তীব্রভাবে হাসিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় আছ?"

"আমি জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বাড়ী যূথিকার নিকট কাজ করছি, রামদাস, আমার মনিব ঠাকুরাণীর গুণের তুলনা নেই; তিনিই ত সে দিন তোমাকে গাড়ী করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যহ তোমার সংবাদ লন। আমি এখন চল্লাম। দেখ রামদাস, দয়া করে এই

কাজটা করো, আমাদের দেখা হলে ভবিষ্যতে তুমি এমন ভাব দেখাবে, যেন পূর্ব্বে আমাদের কখনও আলাপ ছিল না। ইহাও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ!"

"না, তোমাকে ভুলতে পারবো না। তোমাকে এত শীঘ্র ছেড়ে দিতেও পারি না। লুলিয়া, অতীতের ঘটনা স্মৃতিপট হতে মুছে ফেলবো; তুমি আবার আমার হও—"মতিয়া মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। রামদাস তাহা লক্ষ্য করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—"না, কেঁদো না। আমার কথা শোন; আমরা এ স্থান ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবো। সেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। লুলিয়া, এখনও আমি তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণভরে ভালবাসি।"

"রামদাস, আমি তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নই!" মতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল এই উত্তর করিল।

"সে বিবেচনার ভার আমার উপর! কিন্তু এখন বল, আমার কথায় সম্মত কি না। তা না হলে, আমি তোমায় ছাড়ব না। তুমি ছাড়, আমার জীবন মরুভূমির সমান, আমি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হবো। একমাত্র তুমিই আমাকে ধ্বংসের মুখ হতে উদ্ধার করতে পারবে। বল, তুমি আমার হবে?"

দু'জনে কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া রহিল। পরস্পরকে বলিবার তাহাদের অনেক কথা ছিল। রামদাস সবল হইয়া উঠিলেই, তাহারা এ দেশ ছাড়িয়া সিংহলে যাইবার বন্দোবস্ত করিল। সেখানে তাহাদের ভরণপোষণোপযোগী কাজ মিলিবারও খুব সম্ভাবনা। দু'টি বিরহ ব্যথিত আত্মা আজ আবার মিলনের পথে অগ্রসর হইতে চলিল।

সংসারের সকল চিন্তাই আজ তাহাদের মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছে; কেবল নিজেদেরই ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের চিত্র তাহারা মানসপটে অঙ্কিত করিতে লাগিল। রামদাসের অগাধ ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ,তাহারপ্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা সত্ত্বেও আজ যে রামদাস আবার তাহাকে বক্ষে স্থান দিল, ইহা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় মতিয়ার অন্তঃকরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; হঠাৎ যূথিকার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—তিনি যে শয়তানের বিপদজালে জড়িত! তাহাকে এ জাল হইতে মুক্ত করিতেই হইবে। মতিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—"আজ তাহলে আসি। হাতে অনেক কাজ আছে, কাল আবার এমনই সময়ে আসব।"

রামদাস সোহাগপূর্ণ স্বরে তাহাকে জানাইল,—"লুলিয়া, বোধ হয় কালই আমি এ স্থান ছেড়ে যেতে সমর্থ হব। এ স্থানের প্রতি আমার একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছে। আর এক তিল এখানে থাকতে ইচ্ছা যায় না। তুমি মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করেছ। আমি কালই নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবো।"

(২১)

মতিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিল, নরেন্দ্র বৈঠকখানা ঘরে যূথিকার সাক্ষাৎ লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেও অমনই এক কোণে লুকাইয়া নরেন্দ্রের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রের মুখের ভাবে সে একটা উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষ্য করিল। যূথিকা ঘরে ঢুকিতেই নরেন্দ্র তাহার চিরাভ্যস্ত কুশল প্রশ্ন করিল,—"আপনাকে আজ ত বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে!"

তারপর উভয়ের মধ্যে নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল ; সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়া মতিয়া বুঝিল, নরেন্দ্র যূথিকাকে এক বন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। মতিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া যূথিকার উত্তর শুনিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে বেলা আসিয়া তাহার হাত ধরিল। ধরা পড়িয়া মতিয়ার মুখ চোরের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। বেলা তাহাকে জানালার নিকট হইতে টানিয়া আনিয়া চুপিচুপি বলিল,—"এখানে দাড়িয়ে কি করছো? আমার ঘরের জানালা থেকে তোমাকে চোরের ন্যায় এখানে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ঘরের ভিতর উঁকি মেরে কি দেখছিলে? এ সবের উদ্দেশ্যই বা কি?"

ভয়ে ও উত্তেজনায় মতিয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে জোড়হস্তে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল,—"ভগবানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন; আমি ওখানে যাই ; ঘরের ভেতর নরেন বাবু আছেন। তাঁকে নজরবন্দি করে রাখাই আমার উদ্দেশ্য। চাকরে শীঘ্র চা নিয়ে আসবে—আমাকে যেতে দিন। আপনি যদি জানতেন—"

"পাগলের মতন কি বকছো? সব কথা আমি এখনই জানতে চাই।"

"হাঁ, আপনাকে সব বলব। কিন্তু এখন নয় ; আপনি আমাকে ধরে ফেলেছেন, আপনার কাছে আর কিছুই লুকিয়ে রাখব না। এখন আর সময় নেই, ছেড়ে দিন। আপনার দিদিকে রক্ষা করবার জন্য আপনার সাহায্যও আমার দরকার।"

"দিদিকে রক্ষা করবার জন্য! এ সব কি বলছো! পাগল হলে নাকি?"

"না, না, আমি পাগল হই নি। আমি সব আপনাকে বলব। এখন যা বলি, দয়া করে শুনুন। আপনি বৈঠকখানা ঘরে যান ; ওদের দু'জনকে একসঙ্গে ফেলে আসবেন না। নরেন্দ্র বাবুর উপর বিশেষ নজর রাখবেন। ওর প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন লক্ষ্য করবেন। কিন্তু সাবধান, উনি যেন কিছু টের না পান। এক মুহূর্ত্তও আর কালবিলম্ব করবেন না।"

বেলা আর উত্তর না করিয়া স্পন্দিত বক্ষে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহার কৌতূহলের মাত্রা কিছুমাত্র না কমিয়া বরং আরও বাড়িয়া গেল। দু'চার মিনিট পরেই চাকরে চা দিয়া গেল। যূথিকার অনুরোধে নরেন্দ্র পূর্ব্বে চা পান করিতে সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু বেলাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই হঠাৎ এক জরুরি কাজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে যূথিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল।

বেলা সংবাদ লইয়া জানিল, নরেন্দ্র যূথিকাকে বনভোজে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু বেলা ভীষণ আপত্তি করিল, যূথিকার কিছুতেই সেখানে যাওয়া হইবে না। তাহারই যুক্তিমত যূথিকা নরেন্দ্রকে এক পত্র লিখিল যে, বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিল না, তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। বেলা চাকর দিয়া তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রকে সেই পত্র পাঠাইয়া দিল।

এই কাজ শেষ করিয়াই বেলা একেবারে মতিয়ার ঘরে গিয়া হাজির হইল। দেখিল, মতিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া মতিয়া উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বেলা তখন তাহাকে ধরিয়া বসিল,—"এবার সব কথা আমাকে বলতে হবে।"

"হাঁ বলবো, শুনুন। নরেন্দ্র বাবু অতি অসৎপ্রকৃতির লোক। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি।"

"আমাদের এখানে আসবার পূর্ব্বে তুমি তাঁকে জানতে?"

"হাঁ; আমি ওঁর কারবারে কাজ করতাম। তখন হতেই জানি। নির্দ্দয় পুরুষ অবলার প্রতি যতদূর অন্যায় করতে পারে, তিনি আমার সেই সর্ব্বনাশ করেছেন। আপনাকে আর বেশী বলা উচিত নয়। এ কথাও বলতাম না, তবে বাধ্য হয়ে বলতে হলো। সুখের লোভ দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করে নিষ্ঠুর পিশাচ আমাকে অনায়াসে ত্যাগ করলে। তবে শুনুন, আপনাকে সব কথাই খুলে বলি। আমার আসল নাম লুলিয়া। আমি এ অঞ্চলে থাকলে পাছে কোনও কথা বাহির হয়ে পড়ে, এই ভয়ে নরেন্দ্র বাবু এক লোক দিয়ে আমাকে সিংহলে পাঠিয়ে দিলেন। আমারও দেশে আর পাপ-মুখ দেখাবার প্রবৃত্তি হলো না। সে সিংহলে নিয়ে গিয়ে আমাকে নিঃসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিল। সেখানে দেখলাম পূর্ব্ব হতেই তাঁর অন্য একজন গুপ্তচর ছিল। অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পথে পথে ভিখারিনীর ন্যায় ঘুরে বেড়াই। আমার শিশুপুত্র অনাহারে পথে মারা যায়। সেখানেই গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত দাসীবৃত্তি করতে নিযুক্ত হই। মনে করেছিলাম, দেশে আর কখনও ফিরব না। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, একজন সহৃদয় মহাপুরুষের অশেষ উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানের আশা হৃদয়ে পোষণ করে, আমি আবার এসেছি। মনে করবেন না, আমি পেটের দায়ে আপনাদের বাড়ীতে কাজ করছি। আমি ইচ্ছা করেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখানে এসে ঢুকেছি।"

"কি উদ্দেশ্য?"

"যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, যাঁর ঋণ আমি জীবনে কখনও পরিশোধ করতে পারব না, তাঁরই কার্য্য সাধনের জন্য আমি এখানে এসেছি। নরেন্দ্র বাবুর বিষয় সব কথা শুনলে, আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। আপনি জানেন, আপনার দিদির অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুর পর এই বিষয় সম্পত্তির কে অধিকারী হবে?"

"হাঁ, জানি, নরেন্দ্র বাবু। তবে কি তুমি বলতে চাও যে—না, তা অসম্ভব, ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।"

"ব্যস্ত হবেন না। প্রমাণ দেখাচ্ছি। আমি এখানে এসে শুনলাম, আপনার দিদির মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। আরও ভেতরের সংবাদ লয়ে জানলাম যে, নরেন্দ্র বাবু যে দিনই দেখা করতে আসেন, সে দিন আহারের পরই আপনার দিদির এরূপ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। আমি সেই থেকেই তিনি এ বাড়ীতে এলেই তাঁর কার্য্যাবলি নিরীক্ষণ করছি। তিনি কতদূর অসৎ প্রকৃতির লোক, তা আমার জানতে তো বাকি নেই!"

"অসম্ভব! নরেন্দ্র বাবু—একজন ভদ্রলোক, দিদিকে বিষ খাইয়ে মারবার মতলব করেছে! এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

"শুনুন, আরও প্রমাণ আছে, গত রাত্রে আমার মূর্চ্ছার মতন হয়, আপনার মনে আছে বোধ হয়। তা দেখে আপনি বলেছিলেন, দিদিও মাঝে মাঝে ঠিক এরূপ ভাবে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হন। আমার অসুখের কারণ কি জানেন? তবে শুনুন। নরেন্দ্র বাবু কাল এখানে এসেছিলেন। চা পানের পূর্ব্বে টেবিলের উপর পাত্রাদি সজ্জিত হলে, চাকরেরা বাহির হয়ে আসে। নরেন্দ্র বাবু কেবল ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন, একবার বাইরের বারান্দায় আসছেন, একবার ঘরের ভেতর ঢুকছেন।' দেখে

আমার মনে সন্দেহ হল। আমি লুকিয়ে তাঁর উপর নজর রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম তিনি পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বার করে আপনার দিদির চায়ের পাত্রে কি ঢেলে দিলেন—"ভয়ে বেলার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে চুপ করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল।

লুলিয়া বলিতে লাগিল,—"তারপর তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি ইতিমধ্যে অলক্ষিতে ঘরের ভিতর ঢুকে সেই পাত্রটির স্থানে অপর একটি সেই রকমের পাত্র রেখে আসি। তারপর যে পাত্রটি বদল করে আনলাম, তা থেকেই একটু চা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে দেখেছিলাম, তাতেই আমার অসুখ করেছিল। এই দেখুন—" বলিয়া লুলিয়া আলমারি খুলিয়া তাহাকে সে পাত্রটি দেখাইল।

"লুলিয়া, লুলিয়া! তাহলে দিদিকে বাচাবার এখন উপায় কি?"

"তাকে নরেন্দ্র বাবুর নিকট থেকে দূরে সরাতে হবে, এই একমাত্র উপায়। আপনারা ত আর তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবেন না। তাহ'লে নিশ্চয়ই তাঁর ফাসি হয়। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনারা কেলেঙ্কারীর ভয়ে সে পথ অবলম্বন করবেন না। অতএব এখান থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়াই একমাত্র উপায়।"

"কোথায় বা নিয়ে যাব?"

"কেন, তাঁর স্বামীর কাছে?"

বেলা চমকিয়া উঠিল। "তাঁর স্বামীর কাছে! তুমি তাহলে দেখছি সব জান?"

"হাঁ, জানি। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ কথা কাকেও

বলবো না। কিন্তু তাঁরই মঙ্গলার্থে আজ আমাকে বলতে হলো। তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, শিশুপুত্রকেও রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন অমিয়কুমার—জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পুত্র! আমি যখন সিংহলে অনাহারে মৃতপ্রায়, তিনি আমাকে খাদ্য ও আশ্রয় দানে রক্ষা করেন। এমন সহৃদয় পরোপকারী ব্যক্তি পৃথিবীতে বড়ই বিরল! আমি প্রথম তাঁকে ছদ্মবেশে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তা জানতে দিই নি। আমিই লোকমুখে পুরাতন সংবাদপত্রে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে কাগজখানি তাঁকে দিই। তাই পড়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর উপকারের এই কিঞ্চিৎ প্রতিদান দিতে পারায়, মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল, কারণ ভেবেছিলাম, তিনি এবার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হবেন। কিন্তু একদিন দেখি, হঠাৎ তিনি সিংহলে ফিরে এলেন। তাঁর মুখ বিমর্ষ ও মলিন। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে অনবধানতা বশত তিনি আমার কাছে প্রাণের কথা সব প্রকাশ করে ফেলেন। তিনি যথার্থই প্রাণভরে আপনার দিদিকে ভালবাসেন এবং তাঁর বিরহে সেই নির্জ্জন প্রদেশে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। তিনি এখন প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। তাঁর জমিতে উৎকৃষ্ট চা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নও আপনার দিদির তুলনায় তাঁর নিকট কিছুই নয়। কিন্তু সে স্থানে তাঁর চতুর্দ্দিকে বিপদ। দুষ্টপ্রকৃতি লোকেরা অর্থের লোভে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করতে কেবল চেষ্টা করছে। একদিন রাত্রে আমি সাবধান করে না দিলে, তাঁর প্রাণ বোধ হয় যেত—”

“তবে, সেও বিপদাপন্ন! এ কথা দিদিকে জানালে, সে নিশ্চয়ই

তাঁর কাছে যেতে চাইবে। যূথিকাও তার চিন্তায় দিনরাত মগ্ন। স্বামীর প্রাণ বিপদাপন্ন জানতে পারলে, সে নিশ্চয়ই সেখানে যেতে সম্মত হবে। তাহ'লে আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নেই। দেরী করলে, দু'ধারেই বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

"কিন্তু একটা কথা। আমি আপনাকে যে সব কথা বল্লাম, আপনার দিদিকে এত খবর জানান হবে না। এ সব আমাদের দু'জনের মধ্যেই গুপ্ত থাকবে।"

(২২)

দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল। হরিচরণ এখন প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু অর্থে যে মানসিক সুখ ও শান্তি আনয়ন করিতে পারে না, তাহা সে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। দেশে ফিরিয়া আসাও তাহার পক্ষে এ অবস্থায় অসম্ভব!

হরিচরণকে রাতদিন চা বাগানের উপর নজর রাখিতে হইত। দুর্বৃত্তেরা চায়ের লোভে আকৃষ্ট হইয়া এখনও মন্দ অভিপ্রায়ে আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুবিধা পাইলেই বাগান লুঠ করিতে উদ্যত হইত। কিন্তু হরিচরণ ও অজিত দলবলে পুষ্ট হইয়া তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিতে লাগিল।

একদিন চা বাগান হইতে একগাড়ী চা বোঝাই করিয়া গোপনে দেবপালের নিকট পাঠান হইতেছিল; দস্যুরা সে সংবাদ পাইয়া পথে গাড়ী আক্রমণ করিল। হরিচরণ এ কথা শুনিবামাত্র অজিত ও জনকতক সশস্ত্র অনুচর লইয়া দস্যুদের উদ্দেশে যাত্রা করিল। মধ্যপথে আসিয়া তাহারা

দেখিল, এক স্থানে একখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাশেই একজন লোক অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া। দু'চার জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহত লোকটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও হরিচরণ তাহাকে চিনিতে পারিল না। পরে পার্শ্বস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, এই লোকটির সহিত তিনজন ভদ্রমহিলা তাহাদের চা বাগানে যাইতেছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছেন। পথে দস্যুরা তাহাদেরও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

হরিচরণ আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া অজিতকে সঙ্গে লইয়া রমণীত্রয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল, চারিজন পুরুষ তিনজন স্ত্রীলোককে ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হরিচরণ বুঝিল, ইহারাই নিশ্চয় সেই পূর্ব্ব-কথিত তিনজন ভদ্রমহিলা। হরিচরণ ও অজিত তৎক্ষণাৎ বেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ব্যাপার সুবিধা-জনক নহে দেখিয়া একজন ভয়ে একটি স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া জোরে ছুট দিল। অপর তিনজন অবশিষ্ট স্ত্রীলোক দু'টিকে ছাড়িয়া দিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। হরিচরণ নিকটে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

"এ কি বেলা, এখানে? তুমি—লুলিয়া? আমি কি স্বপ্ন দেখছি!"

বেলা তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল। হরিচরণের হাত ধরিয়া বলিল,—"হরিচরণ, আমরা এসেছি,—তোমার কাছে। কিন্তু দিদিকে বাঁচাও!" এই বলিয়া যে দিকে যূথিকাকে দস্যু লইয়া গিয়াছে, অঙ্গুলি দ্বারা সেই দিক দেখাইয়া দিল।

হরিচরণ তাহাদের সে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে

দিকে ছুটিল। পলাতক লোকটা তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রাণভয়ে যূথিকাকে ছাড়িয়া দিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। হরিচরণ নদীতীরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে অপর পারে উঠিয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরিচরণ তখন যূথিকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে, মানসিক উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে যূথিকা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বিশ্রামার্থ বসিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা ও লুলিয়া নিরাপদ শুনিয়া সে অনেকটা শান্ত হইল।

কিছুক্ষণ পরে হরিচরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাকে এখন কথা জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করি না। তবুও তোমরা এ দূরদেশে হঠাৎ কি উদ্দেশ্যে এসেছ, তা ভাল বুঝতে পারছি না! জানবার জন্য বড়ই কৌতূহল হচ্ছে।"

যূথিকার মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "লুলিয়ার সঙ্গে আমরা এখানে এসেছি। তাহার স্বামী রামদাসও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তোমার এ ঠিকানা তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি।"

"লুলিয়া আমার আসল পরিচয় জানতো। সেই দেখছি, এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে। তোমরা তাহ'লে আমারই অন্বেষণে এসেছো?"

যূথিকা উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। হরিচরণ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল,—"তোমরা আমাকেই খুঁজতে এসেছ? কি দরকার জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

প্রথমবার উত্তর দিতে যূথিকা চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। পরে অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"লুলিয়ার মুখে শুনলাম, তুমি বিপদাপন্ন।"

হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহ তখন কাঁপিতেছিল; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

"তোমরা শুনেছ যে আমি বিপদজালে জড়িত, তাই এসেছ, কিন্তু আসবাব কি দরকার ছিল?"

যথিকা আর কিছু না বলিয়া তাহার অশ্রু-ভারাক্রান্ত নেত্রদ্বয় তুলিয়া হরিচরণের মুখের দিকে তাকাইল।

"যূথিকা! যূথিকা! আমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমা কর।" এই বলিয়া হরিচরণ যূথিকার বাম হস্তখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

(২৩)

যূথিকা ও বেলা যে সিংহলে গিয়াছে, এ কথা অশোক বাবু ব্যতীত আর কেহই জানিত না। তাহারা বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছিল যে কিছু-দিনের জন্য বিদেশে বেড়াইতে যাইতেছে। নরেন্দ্রেরও মনে কিছু সন্দেহ হয় নি। কারণ ভগিনীদ্বয়ের বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে এমন কিছু ঘটে নাই যাহাতে নরেন্দ্রের মনে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতে পারে।

কিছুদিন পরে নরেন্দ্র একদিন প্রাতে সংবাদ পাইল যে যূথিকা ও বেলা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া যূথিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহাদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিতেই বেলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বেলা তাহাকে জানাইল যে পথভ্রমণ-জনিত ক্লেশে যূথিকা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর নীচে নামিতে পারিবে না। বেলা তখন একটি ছোট বাক্স নরেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল,—"আপনার জন্য

বিদেশ হতে কিছু উপহার এনেছি। সামান্য জিনিষ,—কিছু মনে করবেন না। এখানে খুলবেন না। আমি এখন দিদির কাছে চল্লাম।" এই বলিয়া বেলা চলিয়া গেল। নরেন্দ্রও নিজগৃহে প্রস্থান করিল। পরে তাহার কুঠিতে গিয়া আফিস-ঘরে লিখিবার টেবিলের উপর বাক্সটি ফেলিয়া রাখিল।

সে দিন রাত্রে গোপাল বাবুর বাড়ী মহা ধূমধাম, তাঁহার কন্যার বিবাহ। সহরের প্রায় সকল গণ্য মান্য ব্যক্তিই এই বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং অধিকাংশই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গোপাল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে সমবেত হইয়া গল্প গুজব করিতেছেন। অশোক বাবুও বিবাহে যোগদান করিয়াছেন। যথাসময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। নরেন্দ্রের ভদ্র ব্যবহারে সহরের সকলেই তুষ্ট। বিশেষতঃ দেশবাসীর হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিয়া সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। নরেন্দ্র ঘরের মধ্যে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল বিন্ধ্যাচলে যে অসভ্য লোকটার সহিত তাহার বচসা হইয়াছিল সে ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া অদূরেই বসিয়া রহিয়াছে। ইহার অর্থ সে সহজে বুঝিতে পারিল না। তবে এখানে তাহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে উহার যে আর রক্ষা নাই, তাহা ভাবিয়া সে মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইল।

গোপাল বাবু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আদর আপ্যায়ন করিবার উদ্দেশে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলেন এবং ঘরের একপাশে অমিয়কুমারকেও উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ অমিয়কুমারের পাশে গিয়া তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক গাঢ়স্বরে বলিলেন, "এই যে অমিয়

কুমার বাবু, কখন এলেন, কেমন আছেন? আপনাকে দেখে যে কতদূর সন্তুষ্ট হলাম, তা আর মুখে কি বলবো!"

অমিয়কুমার যূথিকা ও বেলার সহিত একত্র না আসিয়া পরবর্ত্তী ট্রেনে মির্জ্জাপুরে আসিয়াছিল। পাছে প্রকাশ্যভাবে গোপাল বাবুর বাড়ী আসিলে তাহার আগমনবার্ত্তা লইয়া সহরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়, এইজন্যই সে একাকী আসিয়া চুপি চুপি বিবাহের সভায় যোগদান করিয়াছিল। বিশেষতঃ সে স্থির জানিত যে গোপাল বাবু ও অপর দু'চার জন বৃদ্ধ লোক ব্যতীত কেহই তাহাকে চিনিতে পারিবে না। আর চিনিতে পারিলেও, এখন সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, তাহার প্রত্যাগমন লইয়া আর একটা বেশী গোলযোগ করিবে না।

অমিয়কুমার উঠিয়া গোপাল বাবুকে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"এখানে আর গোলমাল করবেন না।" এই বলিয়া সে গোপাল বাবুকে একধারে ডাকিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। গোপাল বাবুর কথা পার্শ্বস্থ সকলেই শুনিতে পাইল এবং ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় সে কথাও মুহূর্ত্তমধ্যে ঘরের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলেই একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল এবং তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আনন্দে করতালি দিতে লাগিল।

অমিয়কুমারের নাম শুনিয়াই নরেন্দ্র ভূতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া লইল। সে কেনই বা ভীত হইবে? অমিয়কুমার ত স্বেচ্ছায় কাগজে কলমে যূথিকাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে! সে ত নিরাপদেই আছে। নরেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া অমিয়কুমারকে অভ্যর্থনা করিল ও বাহ্যতঃ এরূপভাব দেখাইল যেন তাহার প্রত্যাগমনে

সে কতই না আনন্দিত হইয়াছে। এমন সময় অশোক বাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"অমিয়কুমার বাবু ত ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর বিয়ের খাওয়াটা আমাদের সব পাওনা আছে, এটা যেন মনে থাকে।"

বৈঠকখানা-ঘর নীরব হইল। সকলেই অশোক বাবুর মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অমিয়কুমারের দিকে তাকাইল। অমিয়কুমার ইতাবসরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনারা শুনে স্তম্ভিত হবেন, বহুদিন পূর্ব্বেই যূথিকার সঙ্গে আমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। কবে বা কেমন করে আমাদের মধ্যে বিবাহ হলো, সে সব অনেক কথা। বহু ঘটনা অল্পকালের মধ্যে আমাদের জীবনে ঘটেছে। সে সব বলবার সময় এখন নহে, পরে সময়মত আপনাদের সব জানাব। বহুকাল পরে আবার নিজের মাতৃভূমিতে আপনাদের সঙ্গে একত্র বাস করবার উদ্দেশ্যে ফিরে এসেছি। আজ আপনারা আমাকে যে আদর অভ্যর্থনা করলেন, আমি জীবনে ত কখনও ভুলতে পারবো না।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই উঠিয়া অমিয়কুমারকে ঘিরিয়া দাড়াইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। সকলের কথার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এই গোলমালের মধ্যে নরেন্দ্র চুপি চুপি সকলের অলক্ষিতে সে স্থান ত্যাগ করিল। সিংহের গ্রাস হইতে কেহ তাহার শিকারলব্ধ প্রাণী ছাড়াইয়া লইলে তাহার যেমন ক্রোধ, হিংসা ও অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, নরেন্দ্রের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হইল।

নরেন্দ্র নিজ কুঠির অভিমুখে চলিল। মনে মনে বলিল, তাহা হইলে অমিয়কুমারের সহিত যূথিকা বিবাহিত! তাহার চেষ্টা সবই বিফল হইল। অমিয়কুমারই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইহা

ভোগদখল করিবে! আচ্ছা, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কারবার হইতে তাহারও ত মাসিক আয় বিস্তর। আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। এরূপ বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে ও ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল।

সে আফিস ঘরে ঢুকিয়া অস্থির চরণে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল। এমন সময় টেবিলের উপর বেলার সেই উপহারের ছোট বাক্সটি তাহার নজরে পড়িল। সে বাক্সটি তুলিয়া লইয়া দড়ি কাটিয়া খুলিয়া ফেলিল। দেখিল তাহার ভিতর জ্যোতির্ম্ময় বাবুর নামাঙ্কিত একটি চায়ের পাত্র রহিয়াছে। পাত্রের গায়ে একখণ্ড কাগজ জড়ান রহিয়াছে। কাগজটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, লেখা রহিয়াছে, "লুলিয়া কর্ত্তৃক প্রেরিত।"

ইহাই যথেষ্ট। কাগজের সহিত পাত্রটি তাহার হাত হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। এই পাত্রেই যে সে একদিন যূথিকার পানের নিমিত্ত তরল বিষ ঢালিয়া রাখিয়াছিল! কিন্তু লুলিয়া ইহা কোথা হইতে পাইল? সেই বা কি রকম করিয়া এ ব্যাপার টের পাইল? তাহা হইলে বেলাও নিশ্চয়ই এ সব সংবাদ পাইয়াছে। সেই ত এই বাক্সটা তাহাকে উপহার দিয়াছে। বিচারে নিশ্চয়ই তাহার শাস্তি হইবে, হয় ফাঁসি নয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। লোক-সমাজে মুখ দেখান ভার হইবে। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এ অবস্থায় এক চিন্তাই অন্ধকারের মধ্যে আলোর ন্যায় মানুষের মনে

উদিত হয়—পলায়ন। ইহাই বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়! সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে গিয়া জিনিষ পত্র গুছাইতে লাগিল। পরে ভোর হইতে না হইতেই মির্জ্জাপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চাকরকে বলিয়া গেল যে হঠাৎ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশ মত বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সে এখনই বিদেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রাতে কারবারের লোকজন কাজে আসিয়া এই আশ্চর্য্য সংবাদ পাইল। গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেবল একজন এই গোলযোগের মধ্যেও একটু বিচলিত হয় নাই। বেলা বাহিরে অপরের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তায় খুব বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে বড়ই সুখ ও শান্তি অনুভব করিল। এরূপ সহজ উপায়ে নরেন্দ্রের ন্যায় একজন বদমায়েসকে হতবুদ্ধি ও ব্যর্থমনোরথ করিতে পারায় তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

(২৪)

গ্রামবাসীরা ও বন্ধুবান্ধবগণ ক্রমে ক্রমে অমিয়কুমার ও যূথিকার বিবাহ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী অবগত হইল। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় পূর্ব্বের ন্যায় আবার বন্ধু বান্ধবের সম্মিলন ও প্রীতি-ভোজের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতিদিন যে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নিস্তব্ধ ও আনন্দহীন বলিয়া সকলের চক্ষে প্রতীয়মান হইত, এখন তাহা আনন্দ ও স্নেহের মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অমিয়কুমারও অল্পদিনের মধ্যেই নিজের সদ্‌গুণের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে ও তাহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে আর একটি শুভকার্য্য বিশেষ

জাঁক-জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। অশোক বাবু ও বেলা বহুদিন হইতেই পরস্পরের প্রেমমুগ্ধ। তাঁহারাও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

একদিন গোপাল বাবু অমিয়কুমারের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জানাইলেন যে নরেন্দ্র এখন সিংহলে, সেখান হইতে সে গোপাল বাবুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছে যে, তাহার শারীরিক অবস্থা বড়ই খারাপ, সে আর দেশে ফিরিবে না, সিংহলেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার কারবার বিক্রয় করিবার ভার গোপাল বাবুর উপরই সে ন্যস্ত করিয়াছে। গোপাল বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা যে, অমিয়কুমারই ইহা ক্রয় করিয়া লয়। অমিয়কুমারও তাহাতে সম্মত হইয়া বলিল,—"তা বেশ, আমিই উহা কিনবো। পৈতৃক কারবার আর কেউ কিনবে, তা হতেই পারে না। এই কারবার হতেই বাবা নিজের অবস্থা উন্নত করেন। ইহাই আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী!"

অমিয়কুমার বিষয়সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। ইহার উপর আবার কারবারের কাজকর্ম্ম পরিচালনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য স্থির করিল, রামদাসকে সিংহল হইতে আনাইয়া কারবারের কার্য্য-পরিচালক নিযুক্ত করিবে। সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিনই রামদাসকে সিংহলে সেই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করা হইল।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে যে লোকের নরেন্দ্র সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, সেই রামদাসই আবার তাহার কারবারের পরিচালক ও অংশীদার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতেই এ কার্য্যে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তদুপরি তাহার এখন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাহার ন্যায় পরিশ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বড়ই বিরল। সে

অল্প দিনের মধ্যেই কারবারের অধীন লোকজনকে মিষ্ট কথায় ও ভদ্র ব্যবহারে বশ করিয়া ফেলিল। পরন্তু লুলিয়াও প্রায়ই তাহার কার্য্যে সহায়তা করিত।

* * * * *

মধ্যে মধ্যে সিংহল হইতে নরেন্দ্রের সংবাদ আসিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহার ন্যায় পাপী ও অসৎপ্রকৃতির লোকও এই বিদেশে আসিয়া ব্যবসায়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সেখানে তাহার অ...র বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছে। প্রতিবেশীরা তাহাকে বিশেষ সম্মানও করিয়া থাকে। কিন্তু এই ধনসম্পদ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা তাহার মনে তিলমাত্র শান্তি দিতে সমর্থ হইল না। সে একাকী এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করে, বিবাহ করে নাই। বাড়ীটি নানা মূল্যবান আসবাবে পরিপূর্ণ, মানুষকে সুখ ও আরাম দান করিতে পারে, এমন কোনও বিলাস-দ্রব্যের অভাব সেখানে নাই। অনেকের দ্বারা বহুবার অনুরুদ্ধ হইয়াও সে আর দেশে পদার্পণ করে নাই। তাহার জীবনযাপনের অদ্ভুত প্রণালী, রোগজীর্ণ দেহ, মুখের বিমর্ষতা ও কঠিনতা দেখিয়া অনেকেরই মনে সন্দেহ হইত যে, এ লোকের অতীত জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার বিষময় কুফল আজ তাহাকে এরূপভাবে ভোগ করিতে হইতেছে!

যূথিকার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর, অমিয়কুমার একবার সিংহলে যাইবার প্রস্তাব করিল। সেখানকার চা-বাগান হইতে এ যাবৎ সে বিস্তর লাভ পাইয়াছে। অথচ একবারও সেখানে না যাওয়া অন্যায়

বিবেচনায় সে সিংহলে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। যূথিকা, বেলা ও অশোক বাবুও তাহার সহিত যাইবেন স্থির হইল।

সিংহলে গিয়া অমিয়কুমার একবার নরেন্দ্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যূথিকাও সে প্রস্তাবে সম্মত হইল। পাছে তাহাদের সুখময় দাম্পত্য জীবনে দুঃখের ছায়া পড়ে, এই ভয়ে বেলা তাহাদের নিকট নরেন্দ্রের পৈশাচিক অভিসন্ধির বিষয় আদৌ জ্ঞাত করে নাই। বেলাও নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিল না। কারণ, এ ক্ষেত্রে আপত্তি করিতে গেলে, সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে।

তাহারা নরেন্দ্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীতে বসিয়াই চাকরকে দিয়া নরেন্দ্রকে তাহাদের আগমন-সংবাদ পাঠাইল। নরেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। তাহার দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত। বয়সের অপেক্ষা তাহাকে অনেক বড় দেখাইতেছিল। গাড়ীর ভিতরে আগন্তুকদের দেখিয়াই তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির ন্যায় মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভয়ে সে পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন সে কোনও ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। ভয়ে ও ঘৃণায় নরেন্দ্রের মুখের ভাব এত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, যেন কে তাহার মুখে মৃত্যুকালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। পার্শ্বস্থ চাকরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

অমিয়কুমার বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এর অর্থ কি? লোকটার চাহনি দেখে মনে হলো যেন ভূত দেখে ভয় পেয়েছে। বেলার দিকে ও রকম ভাবে তাকিয়ে রইল কেন? যাই, একবার ভেতরে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসি।"

"না, না, আর যেতে হবে না। এর কারণ আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সে কথা বড় গোপনীয়। কাকেও বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। ওঁর কাছে যাবার আর প্রয়োজন নেই। নরেন্দ্র বাবুকে আপনারা যেরূপ মন্দ বলে জানেন, তিনি তার চেয়ে আরও বেশী খারাপ। চলুন, আমরা চলে যাই।"

পরে অশোক বাবুর হাত ধরিয়া বেলা তাঁহাকে বলিল,—"তোমাকে একদিন এ সব কথা বলবো। কিন্তু আর কাকেও নয়।" বেলার দেহ কাঁপিতেছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি ভুল মনে করেছিলাম, বুঝি পাপের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হলো না!"

সমাপ্ত

গ্রন্থকার প্রণীত ছোট গল্পের বই

শুকতারা

অন্নদা বুকষ্টলের ৷৹ সংস্করণের নবম গ্রন্থ।

দুই রংয়ের কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই, ১৫০ পৃষ্ঠা।

মূল্য ৷৹ মাত্র।

প্রসিদ্ধ মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা কর্ত্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত।

"অন্নদা বুকষ্টল এই গ্রন্থখানিকে আট আনা সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছে। কয়েকটী ভাল গল্পের সমষ্টিতে পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। উপন্যাস-পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।" অর্চ্চনা।

"All the stories are well-written and the style is throughout chaste and simple. The author has shown unmistakable proof of his power of story-telling."—*The Bengalee.*

"'শুকতারা' অন্নদা বুকষ্টলের আট আনা সংস্করণের বহি—রূপের নেশা, বিবাহের যৌতুক, অন্ধ, যুগলবন্ধু প্রভৃতি ৮টি গল্পে পূর্ণ। গল্পগুলি নানা ধরণের—রচনায় ক্ষমতার পরিচয় সপ্রকাশ। আমরা আশা করি, অনিল বাবুর সাহিত্য সাধনা নিষ্ফল হইবে না।"—দৈনিক বসুমতী।

"অনিলচন্দ্র সাহিত্য-ব্রতে নূতন ব্রতী। আভাসে ভবিষ্যৎ সাফল্যের বীজ দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। নবীন লেখকের সাহিত্য-সাধনা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।"—নায়ক।